নীহারিকা

আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ পত্রিকা

২০২২-২০২৩

দ্বাদশ সংখ্যা

আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ

যোগীবটতলা, বারুইপুর, কোলকাতা -১৪৫

কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মোঃ রওশন আলি

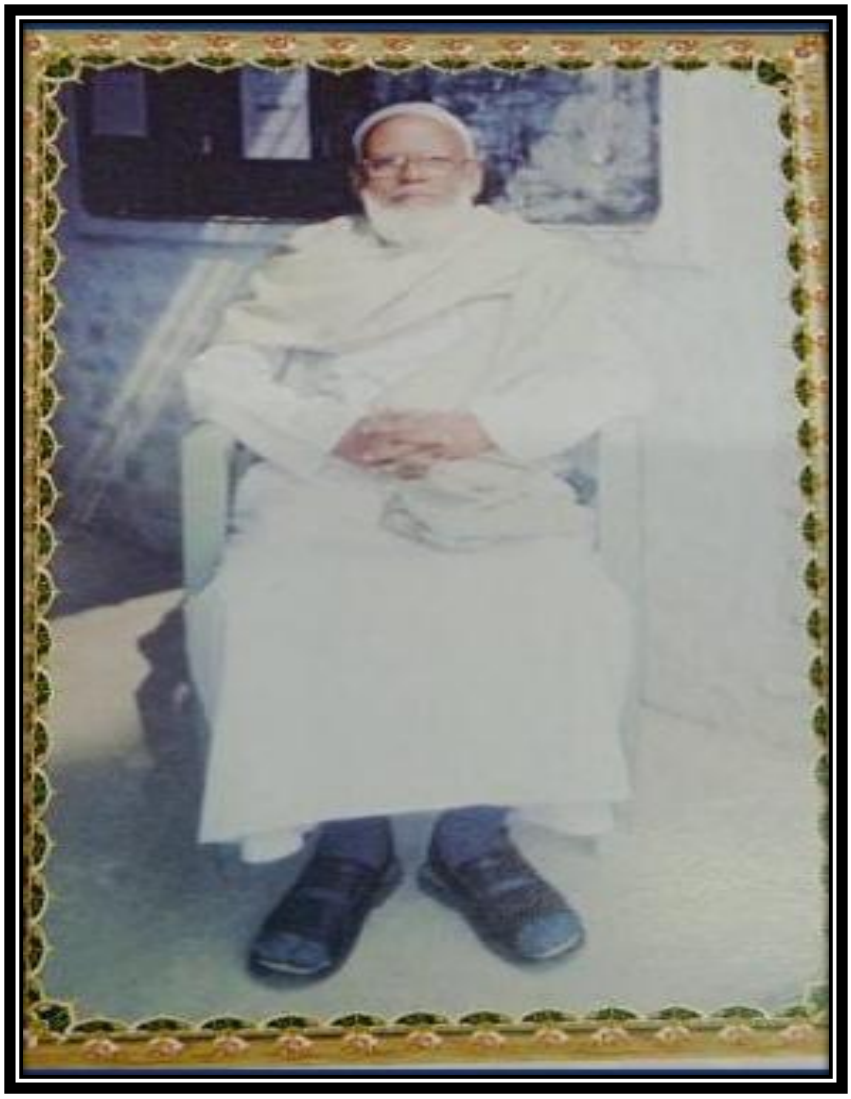

কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দের একাংশ

ছাত্র ছাত্রীদের একাংশ

সেমিনার

Seminar on Faculty Development Programme On Training
on Revised NAAC Accreditation Framework
Seminar Topic:
Revised NAAC Accreditation Framework
College Multipurpose Hall
Organised by
Al Ameen Memorial Minority College
Ameen Memorial Minority College
Baruipur, Kolkata 700145

ক্লাস টেস্ট পরীক্ষায় উর্ত্তিণ ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ

কলেজের পত্রিকা বিভাগ

সম্পাদক - অধ্যক্ষ ড. নুরুল হক

সহকারী সম্পাদক - অধ্যাপক : আজমিরা খাতুন
শায়েরা বেগম
মাতিন আহমেদ
সেখ আসগার আলি
আব্দুল আলি খান
দিলীপ কুমার হালদার
তাজউদ্দিন আহমেদ
আসাদুল্লা খান

সম্পাদকের কলম

কলেজ পত্রিকা 'নীহারিকা'র পথ চলা শুরু ২০০৯- ১০ শিক্ষাবর্ষে। তারপর প্রতি বছর পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। আমাদের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ তাদের স্বরচিত মূল্যবান লেখনি দিয়ে উত্তরোত্তর কলেজ নীহারিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন। যদিও মাঝে কয়েকটি বছর করোনা মহামারীর অভিঘাতের জন্য পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব হয়নি।

তবে পত্রিকা কমিটি আবার প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এ বছর অর্থাৎ ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ' নীহারিকা ' তার দ্বাদশতম সংখ্যার স্মারক। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অশিক্ষক অনেকেই তাদের সুন্দর ও উন্নতমানের প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ,ভ্রমণ কাহিণি ইত্যাদির মাধ্যমে পত্রিকা আকর্ষণীয় করতে সহযোগিতা করেছেন।

আমি পত্রিকা কমিটি এবং যারা পত্রিকা কম্পোজিং, প্রচ্ছদ অঙ্কন এবং মুদ্রণে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সহ সকলকে আন্তরিক ধণ্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, নীহারিকা আগামী দিনে তার প্রকাশ সফলগতিতে অব্যাহত রাখুক - এই প্রার্থনা করি।

ডঃ নুরুল হক
অধ্যক্ষ
আল আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ

১১ ই জানুয়ারী, ২০২৩
বারুইপুর

কবিতা

অনুগল্প

বড় গল্প

প্রবন্ধ

বিশেষ রচনা

ভ্রমণ কাহিনি

সূচিপত্র

কবিতা

আল্লামা ইকবাল- ফারিদা খাতুন (শিক্ষা কর্মী)
মনুষ্যত্ব - অধ্যাপিকা ফারহা খাতুন (বাংলা বিভাগ)
২০২১ - বেনজির খাতুন (শিক্ষা কর্মী)
পুজোর গন্ধ – অধ্যাপক নাসিফা লস্কর (ইতিহাস বিভাগ)
ঈদের দিনে - তাজউদ্দিন আহমেদ (শিক্ষা কর্মী)
নববর্ষ ২০২২- আনিস উদ্দিন মোল্লা (শিক্ষা কর্মী)
Friendship- Naoman Basir (English)
আরোও একটি স্বাধীনতা - নামিরা খাতুন (বাংলা)
বিপন্নতা - আফসানা খাতুন (দর্শন)
Honesty- সিমরান গাজী **(ইংরেজি)**
শহর কলকাতা- রাবিয়া খাতুন(ইতিহাস)
ভুল-মানজুয়ারা খাতুন (বাংলা)
ঝটিকা সফর- রুবিনা খাতুন(দর্শন)
ছোট্ট ঘর- নাসিরা খাতুন (আরবি)
রাখি বন্ধন-মাসুদা খাতুন (শিক্ষাবিজ্ঞান)
فيروس كورونا وتأثيره في الهند-
অধ্যাপক সেখ আজগর আলী(আরবি বিভাগ)

অনুগল্প

আদরের আশ্রয় – অধ্যাপক রাইসা রহমান (বাংলা বিভাগ)

প্রবন্ধ

স্বরূপে শিশুসাহিত্য - অধ্যাপক শায়েরা বেগম(বাংলা বিভাগ)
বাংলা সাহিত্যে ছোটদের রামায়ণ- লতিফা খাতুন (বাংলা)
আমার বাংলা ভাষা - অধ্যাপক গোবিন্দ মণ্ডল (ইতিহাস বিভাগ)

ভ্রমণ কাহিনি

হায়দ্রাবাদ ভ্রমণ - তানিয়া খাতুন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
বারুইপুরের খুঁটিনাটি - অধ্যাপক আজমিরা খাতুন (বাংলা বিভাগ)

বিশেষ রচনা

আমাজন- রহিনা খাতুন(বাংলা)
অমুসলিমদের সঙ্গে আচরণে কেমন ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- জামিলা খাতুন (আরবি)
শিক্ষক দিবস এবং ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন –
নজরুল মণ্ডল- (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)
আবু বকর (রা.) সংকলিত কোর আনের বৈশিষ্ট্য - কারিমা খাতুন (আরবি অনার্স)
চিঠি বনাম মোবাইল – রমজান আলি পিয়াদা(ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)
কোনটা বেশি শক্তিশালী : সমালোচনা করা নাকি সমালোচি হওয়া - وَيْلٌلِّكُلِّهُمَزَةٍلُّمَزَةٍ– মাইমুনা তাহেরা (বাংলা)
নিজস্ব কথন – সুমাইয়া খাতুন (বাংলা)
শুদ্ধ সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা - ফাতেমা খাতুন (বাংলা)

মনুষ্যত্ব

অধ্যাপিকা ফারহা খাতুন

বিষাক্ত শহর
ঘিরে রেখেছে পাশবিকতা,
-অর্থলোলুপ নৃশ্বংস মানসিকতা
পাহারায় আছে চার প্রহর!
হেরেছে শিক্ষা, হারিয়ে গেছে মনুষ্যত্ব।
সত্যকে চাপার মিথ্যা নানান তত্ত্ব
বিশ্বাসে অবিশ্বাসের খেলায় হেরেছে কত প্রাণ,
ধুলোয় মিশেছে মনুষ্যত্ব, লোপ পেয়েছে সম্মান।
মেতেছে মানুষ উল্লাসে, ভুলেছে নিজের পরিচয়।
আসবেনা কি ফিরে শান্তি, হবেনা মনুষ্যত্বের জয়?

আল্লামা ইকবাল

ফারিদা খাতুন (শিক্ষা কর্মী

হৃদয়ের এলবামে তুমি
বাধা রবে চিরকাল ।
প্রিয় কবি মোর
আল্লামা ইকবাল ।
তোমার কবিতা গোলাপ হয়ে।
ফুটে থাকুক মোর জীবনের বাগানে।
ভাব ভাষা আর ছন্দ হৃদয়েতে ঢেউ আনে।

২০২১

বেনজির খাতুন (শিক্ষা কর্মী

২০২১তোমার জানাই
শেষ বিদায়ের গান,
দুঃখ মোদের কন্ঠ বোজা
তাইতো ম্রিয়মান
২০২১তোমারে জানাই
শেষ বিদায়ের গান।

রাতের বেলায় যাওয়ার সময়
করোনা অভিমান,
ফুলের হাসি হাসো তুমি
হইও নাকো ম্লান।
২০২১ তোমার জানাই
শেষ বিদায়ের গান।

জানি তোমার বিদায় দিতে
ব্যথা মোদের বুকে লাগে
তাইতো মোরা শোকে মুহ্যমান,
২০২১ তোমার জানাই শেষ বিদায়ের গান।

২০২১ জানিয়ে গেল
সুখ দুঃখের কথা, হৃদয় মোদের শূন্য আসন
গভীর ক্ষত,ব্যথা।

মোদীর দেহে
তোমার রক্ত বহমান,
২০২১ তোমার জানাই
শেষ বিদায়ের গান।

পুজোর গন্ধ

অধ্যাপিকা নাসিফা লস্কর

আকাশে বাতাসে পুজোর গন্ধ।
রবির কিরণ নীল আকাশ চারিদিকে খুশির আনন্দ।
মাঠের মাঝে ধানের মেলা
নদীর তীরে কাশের ভেলা।
নতুন জামার গন্ধে
পড়াশুনার ছন্দে।
মহা আনন্দ সবার মাঝে
নতুন জামায় নতুন সাজে।
বৈদ্য পাড়ায় ঢাকেরসুর
পাড়ায় মন বসে না আর,
জোড়া শালিক দুই বেলা
কুঞ্জে কুঞ্জে করে খেলা।
শরৎ আকাশ উৎসবে ভরা পড়াশুনায় নেই সাড়া।
পূজো মানেই হারিয়ে যাওয়া
দূর দেশ বিদেশে।
পুজো মানেই মিষ্টিমুখ
ছোট বোড় নতুন বেশে।
মা গেলেন ফিরে কৈলাসেতে
দুঃখ ভরা নদীর স্রোতে।
এমনি করে প্রতিবছর
এসো মা গো আনন্দ নিয়ে।

ঈদের দিনে

তাজউদ্দিন আহমেদ (শিক্ষা কর্মী

রমযানেরই রোযার শেষে
এল খুশির দিন
হৃদয় মাঝে সুখের জোয়ার আনন্দে রঙীন।

ধনী-গরীব নয় ভেদাভেদ
পর নয় কেউ আজ,
সবার মুখে হাসির ঝিলিক মাথায় হরেক তাজ।

বুকে বুকে মিলন মেলার আজি তো সেই দিন
প্রাণের মাঝে সুখের ছোঁয়া বাজুক হৃদে বীন

নববর্ষ ২০২২

আনিস উদ্দিন মোল্লা (শিক্ষা কর্মী)

নববর্ষের দিনগুলি সব আলোয় ভরে উঠুক ।
ছেলে মেয়ের মনের মাঝে শান্তি ফিরে আসুক ।
নতুন দিনের নতুন শিশু চাঁদের হাসি হাসুক।
ভালোবাসার চুমু দিয়ে স্নেহের দোলায় দুলুক ।
নতুন দিনের খুশির ছোঁয়া প্রাণের ঘরে লাগুক।
ফেলে আসা দিনগুলি সব স্মৃতি হয়ে থাকুক ।

Friendship

Naoman Basir (English)

In the cycle of life, where seasons swing,
Friendship grows in a timeless wing.
A seed of trust, in kindness sown,
Grows into trees where love is known.

Through fair dawns and shadowed nights,
It glows with soft, enduring lights.
No storm can wither its strong core,
A retreat of peace, forevermore.

Laughter rings like a joyful tune,
Under the sun, or beneath the moon.
Shared moments, a treasure untold,
Worth more than riches or gems of gold.

In silence, it speaks; in sorrow, it stays,
A bond that guides through life’s maze.
Unseen threads, yet tightly spun,
Friendship binds hearts into one.

So let us cherish, hold it near,
This sacred bond we hold so dear.
For in this world, so vast, so wide,
True friendship is a faithful guide.

আরোও একটি স্বাধীনতা

নামিরা খাতুন (বাংলা অনার্স)

পার হলাম স্বাধীনতার চুয়াত্তরটা বছর!
গুনে নিলাম আরোও একটি দুঃস্বপ্নের প্রহর।
বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরিয়ে তুলেছি
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি উন্নতির সাথে মিলিয়েছি।
আমাদের কর্মমুখর জীবনের প্রতিবিম্বে
আধুনিকতার মন্ত্রে আর মানবের মহাদম্ভে।
সভ্যতার চাবিকাঠি আমাদেরই হাতে-
লক্ষ মানুষের প্রাণবায়ু পারিনি জোগাতে।
আপন স্বার্থে মগ্ন মানব নিজেতে
তাকাইনা সেই অন্ধকারের জগতে।
যেখানে আজও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকটভাব
সমাজে এখনও সংস্কারের বড়ই অভাব।
শিক্ষার আলো প্রবেশ করে নি অন্তরে
ধর্ম শুধুই ধ্বজা হয়ে উড়ছে সভ্য- বন্দরে।
স্বাধীনতার মন্ত্রে গড়া নতুন সভ্যের অপেক্ষায়
বাঁচার মতো বাঁচবে মানুষ রয়েছে তারই প্রতীক্ষায়।

বিপন্নতা

আফসানা খাতুন (দর্শন)

সারারাত, তোমারই মুখে শুনেছি,
আমার নামেরই সশব্দ চিৎকার, বিনম্রধ্বনি...।
এই কণ্ঠ অনেক উচ্চ
কিন্তু বেদনায় আসীন।
এই কণ্ঠ কিছু পরিচিত
কিন্তু কিছুটা অচিন,
এপাশ, কখনো বা ওপাশ ;
এইভাবে সারাটা রাত,
বুকের ভিতর প্রশ্ন সহস্র,
তবুও মুঠোয় আসেনি সে মুঠোফোন,
আলগা হয়েছে সমস্ত আঙুল সকল।
আবারও মুষ্টিবদ্ধ
সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
না, মনে করিয়ে দেওয়ার,
জোর করে, কোনোই মানে নেই ।
সবই আসে অনায়াসে, যা যা কিছু স্বতঃস্ফূর্ত, সরল।
জোর করে মনে করিয়ে দেওয়ার আমি ঘোর বিপক্ষে...

Honesty

সিমরান গাজী(ইংরেজি)

In a world of shadows, dim and gray,
Honesty shines like the break of day.
A beacon bright, steadfast and clear,
A voice of truth we hold most dear.

No mask it wears, no web it spins,
Its beauty lies in where it begins.
From hearts sincere, with courage strong,
It rights the wrong, and rights belong.

Through storms of doubt, it paves the way,
Dispels the dark, brings light to stay.
A friend to trust, a guide to see,
The boundless grace of honesty.

So guard it well, this treasure rare,
Its worth beyond what gems compare.
For in its glow, our spirits soar,
A gift eternal, forevermore

শহর কলকাতা

রাবিয়া খাতুন **(ইতিহাস অনার্স)**

আকাশচুম্বী অট্টালিকা, গগন ছোঁয়া বাড়ি।
তারই মাঝে গ্রাম ছেড়ে কলকাতাতে পাড়ি।।

সকাল হতে সন্ধ্যা মানুষ নিজের কর্মে ব্যস্ত।
অফিসের চাপে দেখা হয় না সায়ংকালের অস্ত।।

ছুটছে গাড়ি ছুটছে মানুষ অর্থ লাভের আশায়।
সর্ব ধর্ম মানুষের মাঝে সচল নানান ভাষায়।।

বেসরকারি অফিসের কাজে প্রশিক্ষকের ভিড়।
অল্প বয়সেই টেকনোলজি পড়তে করেছে মনস্থির।।

ব্যস্ত শহর ব্যস্ত মানুষ বিবিধ কাজের আনাগনা।
অফিস পাড়ার মানুষ গুলো কাজ না সেরে যায়না ।।

সপ্তাহ শেষে সবার সাথে দিন কাটানোর ইচ্ছা।
রবি শেষে সোম প্রভাতে অফিস যাওয়ার চেষ্টা।।

ভুল

মানজুয়ারা খাতুন (বাংলা অনার্স)

কিছু ভুল মুছে যায়
থেমে যায় কান্নায়
কিছু ভুল আজন্ম
শোধরানো যায় না।
কিছু ভুল ফুল হয়ে
মাটিতে ঝরে যায়,
কিছু ভুল ফিস্ ফিস্
চারিদিকে শোনা যায়।
কিছু ভুলে আছে
দেখ অপার শান্তি,
কিছু ভুল দিয়ে
যায় জীবনের ক্লান্তি।
কিছু ভুল, ভুল নয়
জীবনের অঙ্গ
সেইসব ভুলগুলি
দিয়ে যায় সঙ্গ।
ভুল তো সেই করে
যে করে কর্ম
অলস মানুষের কাছে
নেই ভুলের মর্ম।

ঝটিকা সফর

রুবিনা খাতুন (দর্শন)

ব্যতিব্যস্ত জীবনের ফাঁকে কিছু সময় পেলে
মনে হয় মোর প্রকৃতির মাঝে কিছু সময় বিলাতে।।

যানবাহনের আওয়াজ ছাড়িয়ে
প্রকৃতিরূপ দেখতে যে চাই।

প্রভাতের আলো ফুটতে না ফুটতেই
ব্যাগপত্র কাঁধেতে ঝুলিয়ে ট্রেন ধরতে যাই।।

মেল ছাড়লেই চলবে বেগে,গাছপালা সব ছুটবে পিছে।
গন্তব্যে পৌছানোর তরে, মোর মন করে আনচান।।

তারই মাঝে বদমেজাজি মিলবে লোকজন,
কিছু লোকের কথা শুনে ফুঁসে ওঠবে মন।

কিছু ভদ্র মানুষের সাথে পরিচয় যখন হবে,
তাদের স্মৃতি ক্যামেরা বন্দী মোদের সাথেই রবে।।

ফিরিবার সময় ট্রেনে উঠে দেখি ভর্তি লোকজন।
সবারই যেন একই লক্ষ্য গন্তব্য পৌঁছাব কখন।।

কেউবা দেয় শহর ছেড়ে চাকুরির জন্য পাড়ি।
উল্লাস ভরা ছুটি কাটিয়ে কেউবা ফিরছে বাড়ি।

ছোট্ট ঘর

নাসিরা খাতুন (আরব অনার্স)

নীল আকাশের নিচে
সবুজ ঘাসের কার্পেটে মোড়া আমার মায়ের ছোট্ট ঘর।
চির শান্তির কোলে মাথা পেতে ঘুমায় আমার স্নেহময়ী মা।
আমি প্রতিদিন চোখ মেলে দেখি আমার মায়ের ঐ ছোট্ট ঘরটাকে।

যখন ভোরের আলো বিদায় নিয়ে সৃষ্টি করে
সুন্দর ধবধবে সাদা সকাল।
গোধূলি বেলায় লাল সূর্য মাথা হেট করে দিগন্তে।
রাখাল বালকেরা ফিরে যায়,তাদের নিজ আস্তানায়।
আমি গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলি ওই ছোট্ট ঘরের দিকে।

এমনি করে দশটি বছর -
প্রতিদিন আমি হেঁটে চলেছি আজও হাঁটছি।।
আমি জানি,কোন একদিন আমার এ হাঁটা শেষ হবে।
আমারও ওই রকম ঘর হবে, এটাই তো নিয়ম।

তার আগে আমাদের সৃষ্টি করে যেতে হবে
একটা সুন্দর আলোয় মোড়া ইতিহাস।

রাখি বন্ধন

মাসুদা খাতুন (শিক্ষাবিজ্ঞান)

বাঙালির ঘরে ঘরে
শঙ্খের ধনী স্বরে
জাতিভেদ ভুলে ছোট বড় একসাথে
মিলন সূত্রে বাঁধা হব রাখি বেঁধেহাতে হাতে
আকাশ বাতাস খুশির জোয়ার
থাকি মোরা নতুন সাজে খুশি ও আনন্দে
এ ভালোবাসা শুভেচ্ছা প্রেম প্রীতি
থাকুক এ অটুট বন্ধন ফুটে উঠুক অমর স্মৃতি
হে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান জৈন
মিলন সূত্রে বাঁধা হয়ে জীবন করো ধন্য
মোরা জাতিতে এক নাহি করি ঘৃণা
মহৎ জ্ঞানের বাণী ওই যাই শোনা।
হে বিশ্বকবি করেছো বঙ্গভঙ্গ রোধ
বিভুর বক্ষে মিলন সূত্রেকরেছ মাতৃজ্ঞান
সেদিন তুমি সব জাতির হাতে
বেঁধে ছিলে রাখি, মিষ্টি আর নতুন স্বাদে
ভোলেনি মানব জাতি ভোলেনি বিশ্বভারত
তোমার বন্ধনে ধন্য মোরা পূজায় রব ব্রত
তোমার আসন শূন্য আছি
তোমার অন্তরালে হয়েছি মোরা ধন্য।

فيروس كورونا وتأثيره في الهند

Prof. SkAsgar Ali

بقلم شيخ اصغر علي

الحمد لله الذي أمرنا بالصبر في الشدائد، وأكرمنا بالعلم في الأوقات الصعبة، والصلاة والسلام على نبينا محمد ﷺ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

في نهاية عام 2019، ظهر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة ووهان الصينية، وانتشر بسرعة كبيرة إلى جميع أنحاء العالم. ومن بين البلدان التي تأثرت بشكل كبير، كانت الهند. حيث عانى الشعب الهندي من آثار هذا الوباء على مختلف الأصعدة، الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

التأثيرات الصحية

تُعتبر الهند من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في العالم، مما جعل التصدي للفيروس تحديًا كبيرًا. مع ازدياد الحالات المصابة بالفيروس، أصبحت المستشفيات مليئة بالمرضى، وواجه النظام الصحي صعوبة بالغة في توفير الرعاية الطبية. في بعض المناطق، كانت هناك أزمة حادة في إمدادات الأكسجين، مما أدى إلى وفاة العديد من المرضى بسبب نقص العلاج المناسب.

أعلنت الحكومة الهندية حالة الطوارئ الصحية، وتم فرض العديد من الإجراءات الاحترازية مثل الحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وفرض إغلاق شامل في بعض الأوقات. ورغم هذه الإجراءات، استمر انتشار الفيروس بشكل سريع في بعض المناطق بسبب الكثافة السكانية العالية، مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا.

التأثيرات الاقتصادية

تأثّر الاقتصاد الهندي بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا. أدى الإغلاق العام إلى توقف العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة، مما أثر على آلاف الشركات وأدى إلى فقدان وظائف العديد من العمال. في الوقت نفسه، تضرر الفقراء والعمال اليوميون بشكل كبير، حيث فقدوا مصدر رزقهم وأصبحوا في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية والمالية.

وفيما كانت الحكومة تسعى لإعادة تشغيل الاقتصاد تدريجياً، كان هناك تحديات كبيرة في التعامل مع تأثير الجائحة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. أظهرت الإحصائيات أن الاقتصاد الهندي قد شهد تراجعًا حادًا في النمو الاقتصادي، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

التأثيرات الاجتماعية

تسببت جائحة كورونا في تغيير جذري في حياة الناس الاجتماعية. فمع فرض قيود على التنقل والاجتماعات العامة، ابتعد الناس عن ممارسة الأنشطة الاجتماعية المعتادة، مثل اللقاءات العائلية والاحتفالات العامة. كما أصبح الكثير من الأشخاص يعانون من الاكتئاب والقلق بسبب العزلة الاجتماعية، والخوف من الإصابة بالفيروس، وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية.

ومع استمرار الجائحة، بدأت بعض المناطق في الهند تشهد تدهورًا في الظروف المعيشية، خاصة في المناطق الريفية حيث عدم توفر الخدمات الصحية الأساسية. ومع ذلك، أظهر العديد من الهنود روحًا كبيرة من التضامن والمساعدة المتبادلة خلال هذه الأوقات الصعبة.

التعليم في زمن الجائحة

من بين أكثر القطاعات تأثراً كان قطاع التعليم. فقد أغلقت المدارس والجامعات في مختلف أنحاء الهند، واضطرت المؤسسات التعليمية إلى الاعتماد على التعليم عن بُعد. ولكن في بعض المناطق الريفية، كان من الصعب على الطلاب الوصول إلى الإنترنت أو الحصول على الأجهزة الإلكترونية اللازمة للتعليم عبر الإنترنت.

نتيجة لذلك، انخفض مستوى التعليم بشكل ملحوظ، مما أثّر بشكل خاص على الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض. كما أدى هذا إلى زيادة الفجوة التعليمية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

الجهود الحكومية لمواجهة الفيروس

سعت الحكومة الهندية إلى مواجهة الأزمة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية. تم فرض الإغلاق التام في وقت مبكر للحد من انتشار الفيروس، كما بدأت حملات واسعة لتوزيع اللقاحات على المواطنين. قامت الحكومة أيضًا بتقديم الدعم المالي للطبقات الفقيرة، وتوفير الإمدادات الطبية للمستشفيات.

كما أطلق المواطنون العديد من المبادرات الطوعية لمساعدة المحتاجين، مثل توفير الطعام والمساعدة الطبية للمصابين.

الخاتمة

على الرغم من الأضرار الكبيرة التي تسببت فيها جائحة كورونا، فإن الهند أثبتت قدرتها على الصمود والتعافي. لقد أظهر الشعب الهندي إرادة قوية لمواجهة التحديات، وتعاونًا بين الحكومة والمجتمع المدني.

وفي الختام ، فإن جائحة كورونا قد علمتنا الكثير من الدروس عن أهمية الصحة العامة، والعمل الجماعي، وأهمية التضامن في الأوقات الصعبة. نسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن العالم وأن يعم السلام والطمأنينة جميع الناس في كل مكان.

والحمد لله رب العالمين

অনুগল্প

আদরের আশ্রয়

অধ্যাপক রাইসা রহমান (বাংলা বিভাগ)

দেখতে দেখতে চোখের সামনেই সহজ -সুন্দর অনাবিল আনন্দে বড় হয়ে উঠলো দুটো নিষ্পাপ প্রাণ ।ইতিমধ্যেই ওদের সাজানো -গোছানো,সতেজ-সুন্দর শাখা -প্রশাখার সজীবতায় এক অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যতা বিরাজ করে নিশিদিন।তারা প্রকৃতির সামনে এক মনোরম মুগ্ধতা নিয়ে মেলে ধরেছে এই রূপের ডালি ।যা নিঃসন্দেহে চোখের এক বিশুদ্ধ আরাম বৈকি !এমন অপরূপ দৃশ্যে দৃষ্টি - মন প্রশান্ত হয় , কখন যেনো অজানা স্নিগ্ধতায় পাড়ি জমায় বিস্তীর্ণ আকাশের পথে।

হলুদাভ বর্ণেরগাত্র আস্তরণে সর্বশরীর রেখাঙ্কিত ।দু একটা ডালপালা ভেঙে পড়েছিলো , প্রচণ্ড বায়বীয় তান্ডবে।আমরা কিছু করতে পারিনি , প্রকৃতির অস্বাভাবিকতা কিছুতেই রোধ করতে পারিনি ; কি ভীষণ সেই অসহায়তা।আজ যখন আমি তাদের কচি কচি সদ্য প্রস্ফুটিত পল্লবীত পত্র দেখে আহাল্লাদিত হই , ওরাও অতি আনন্দে খিল খিল করে উচ্চস্বরে হেসে ওঠে ।সবুজের মাঝে লাল বর্ণের এ এক বিচিত্র শোভা ।মনে হয় চক্ষু -কর্ণ উপবাসে ছিল কতকাল-কতদিন-রাত্রি এই সুখধ্বনিবিহনে।

আসলে ওরাও তো কত অজানা অথচ সুপরিচিত শত শত শতাব্দীর পিতা -মাতা-সন্তানসম মোদের ।এখনও কি সময় হল না জেনে নেওয়ার, জেনে যাওয়ার?

দুই বছরের অধিক সময়ের ব্যবধানে ওরা কেমন যেনো প্রকান্ড হয়ে ওঠার প্রয়াস পেয়েছে ।প্রচণ্ড কাঠফাটা রৌদ্রের উঠানকে ওরা দিয়েছিল অনেকটা শান্তির আশ্রয়, আজও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি।

ওদের আশ্রয়ে এখনোনরম -নরম লেজ আর হলুদ -সাদা গাত্র ফুলিয়ে দুই বিড়াল মুখোমুখি দাঁড়ায় , অনেক কথোপকথনের পর কিছু বিচিত্র আওয়াজ আর মুখভঙ্গিমার বিবাদে লিপ্ত হয় ।কখনো গাত্র কম্পনের মাধ্যমে তাদের তেজের তীব্রতা জাহির করে।

আজও শুধু মাত্র শাখা প্রশাখার হিন্দোল ব্যতীত নির্বাক, শুধু নিস্পলক তাকিয়ে আমাদের প্রিয় এই দুই বৃক্ষপ্রাণ – আম আর জাম।

প্রবন্ধ

স্বরূপে শিশুসাহিত্য

অধ্যাপক শায়েরা বেগম (বাংলা বিভাগ)

বৃক্ষের যেমন শাখা-প্রশাখা অগনিত, তেমনি বাংলা সাহিত্যও নানান শাখা-প্রশাখায় সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের নানান গতিশীল ধারার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ধারা হল শিশুসাহিত্য।

'শিশু' শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচিতি নতুন নয়। অভিধানে 'শিশু' শব্দের অর্থ হল- আট (মতান্তরে ১৬) বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক। 'চলন্তিকা'য় পাই শিশুর অর্থ 'অল্প বয়স্ক বালক '।আবার 'বঙ্গীয় শব্দকোষ ' জানাচ্ছে 'অচিরোদিত, নব, অবোধ, অষ্টম বর্ষের অনধিক- বয়স্ক বালকই হল শিশু। ইংরেজি অভিধানে ও প্রায় একই কথার সমর্থন মেলে-শিশু হল- "Transfer one who is as a child in character, manners, attainments and especially in experience or judgement."

অর্থাৎ, সব মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় , শিশু হল এক নবোদিত , অবোধ, ক্ষুদ্র প্রাণকনিকা, যা পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে তার চরিত্র, ব্যবহার, শারীরিক ও মানসিক গঠন সব দিক থেকেই আলাদা।

সাহিত্য রচনা হল লেখকের মনের স্বাধীনতা ও অন্তরের ব্যাকুলতার বহিঃপ্রকাশ। লেখক নিজস্ব অনুভূতি নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু শিশু-কিশোরদের উপযোগী সাহিত্য রচনার কাজ মোটেই সহজ নয়। এক্ষেত্রে শিশু মনস্তত্ব বুঝে সহজ-সরল ভাষায় লেখককে সাহিত্য সৃষ্টিকর্মে ব্রতী হতে হয়। শিশু-কিশোরদের নিষ্পাপ কচিমনের সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি ও আশা- আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন স্পন্দিত হবে যেসব সাহিত্যকর্মে, তাকে শিশুসাহিত্য বলা যায় । তাই "কবি সাহিত্যিক লেখকগণ শিশু-কিশোরদের বয়স , মন, কল্পনাশক্তি, ভাব-ভাবনা, চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতিকে সামনে রেখে রচনা করতে থাকেন যুগোপযোগী শিশু সাহিত্য।"

শিশুসাহিত্য আমরা আমরা বুঝি-মানুষের মন আনন্দের সন্ধানী। যেসব ছড়া , গল্প, কবিতা, নাটক, রূপকথা ইত্যাদি শুনে বা পাঠ করে শিশু ও কিশোরেরা আনন্দ অনুভব করে ; - তার কল্পনাশক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটে। তাকেই আমরা শিশুসাহিত্য আখ্যা দিতে পারি।

শিশু সাহিত্য রচনার প্রাথমিক শর্ত অবশ্যই শিশু-মন বোঝা। অপক্ক মনের হদিশ পেতে হত শিশুসাহিত্যিককে। তাই 'শিশুসাহিত্য' বলতে মুখ্যত শিশুদের উপযোগী সাহিত্য চর্চাকেই বোঝায় তাই শিশুসাহিত্যিকের ওপরেই সবকিছু নির্ভর করে। শিশুর মন কোমল , সে প্রকৃতির সন্তান-তাই বাস্তব জীবনের রূঢ় আঘাত , নিষ্ঠুরতায়, হিংসা-দ্বেষ রক্তপাতে সে ব্যথিত হয় , দুর্বলের ওপর সবলের আঘাত শিশুমনকে পীড়িত করে। আবার , সমাজ বা পরিবারপর প্রভাবে তার মনে সৎ-অসৎ , ভালো-মন্দ বা উচিত-অনুচিতের যে বোধ তৈরি হয়ে গেছে , সাহিত্যের মধ্যেও সে তারই প্রতিফলন দেখতে চায়। শিশু কল্পনাবিলাসী , বাস্তবে সে যা পায়না , কল্পনার রাজ্যে তাই তার পাওয়া হয়ে যায়।

ভাষা ব্যবহারেও শিশুসাহিত্যিক সচেতন থাকেন। শিশুমনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে , তাদের বুঝতে পারার মত করে ভাষা ব্যবহার করেন শিল্পী। যে ভাষায় শিশু কথা বলে, ভাবে, শিশুসাহিত্যের ভাষা ও তাই হওয়া দরকার।

শিশুসাহিত্য হতে হবে নির্ভার। তাতে এমন কোন নীতির বাড়াবাড়ি থাকবে না , যা শিশুর ক্ষেত্রে বোঝা বলে মনে হয়। আমরা জানি যে , শিশু জাতির ভবিষ্যৎ, তাই তাকে ছোট থেকেই শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টার অন্ত নেই। শিশুসাহিত্যিকও এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু শিশুদের ভোলানো এত সহজ নয়- ''নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় , যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না , যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে , যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।"

হেমেন্দ্রকুমার রায় ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে যোগীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মরণী গ্রন্থে লিখেছিলেন- "যাঁরা শিশুসাহিত্য রচনার ভার নেন, তাঁদের অনেকে প্রধানত দু'রকম ভুল করেন। প্রথমত, কেউ কেউ বিষয় গম্ভীর সহকারে উপদেশকের মতো শিশুমহলে গিয়ে কথকতা করতে চান। দ্বিতীয়ত , কেউ কেউ মনে করেন , উচ্চতর রচনাপদ্ধতি বা কলাকৌশল ছেড়ে আজেবাজে ছেলেমানুষি করলেই ছোটরা তাঁদের লেখা পছন্দ করবে।

কিন্তু তারাও জানেন না। শিশুদের মধ্যে যথেস্ট কাব্যগ্রাহিতা আছে এবং তারা উপদেশকে ভলোবাসে না।"

'উপদেশকে ভালবাসে না' কথার সত্যতা স্বীকার করেও বলতে হয় , অনেক সফল শিশুদের জনপ্রিয় লেখা কিন্তু কোনো না কোনো উপদেশ বা নীতিকথা বহন করছে। আসলে উপদেশ বা নীতিশিক্ষা উপস্থাপনার কৌশল জানতে হয় শিশুসাহিত্যিকদের।তাতে মুন্সিয়ানা দেখাতে পারলে শিশুমন তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবেই।

প্রকাশভঙ্গীর পরে আসে বিষয়ের কথা। কল্পনার প্রাবল্য, রূঢ়-কঠোর বাস্তবকে অন্যভাবে প্রকাশ করা শিশুসাহিত্যের অলিখিত শর্ত। কিন্তু যেকোনো সাহিত্যের মতই শিশুসাহিত্যের বিষয়ও ব্যাপক ও বিচিত্র হতে পারে। প্রাচীন ইতিহাস, পুরাণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, জীবনের নানা জিজ্ঞাসা, অ্যাডভেঞ্চার, মনুষ্যেতর প্রাণীর জগৎ- সব কিছুই শিশুসাহিত্যের বিষয় হতে পারে।

বিষয়ের সঙ্গে আসে সাহিত্যের সংরূপের কথা। যে বয়সের শিশুর পক্ষে যা উপযোগী , সেইভাবেই এর ভাগ করা হয়। প্রথম দিকে ছড়ার মধ্যেই শিশু সাহিত্যের আনন্দ খুঁজে পায়। ছড়ার মধ্যে সুরের দোলা , এর চিত্রময়তা তাকে মুগ্ধ করে। ৬-৭ বছর বয়স থেকে শিশু গল্প পড়ে বুঝতে শেখে। ছড়া ও গল্পের আঙ্গিকের তফাৎ বুঝতে পারে। অপেক্ষাকৃত বড় বয়সের , কিশোর-কিশোরীদের জন্য উপন্যাস লেখা হয়। তাই শিশুসাহিত্য সংরূপ ব্যবহৃত হয় শিশুর বয়সের কথা মনে রেখে। ছোটরা কী চায়, কী পড়তে ভালোবাসে, আজ বাংলাদেশে তার সংখ্যাগননা যদি করা হয় , তাহলে বিচিত্র রকমের ফল পাওয়া সম্ভব। আবহমানকাল ধরে প্রচলিত বাংলার ছেলেভুলানো-ছড়া , ঘুমপাড়ানি-ছড়া, রূপকথা, লোককথাকে অনেকে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন।

শিশুদের জন্য লেখার প্রথম নিদর্শন বলা যায় , পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র'কে। এরপরে রচিত হয়েছে 'বৌদ্ধজাতক' বা নারায়নের 'হিতোপদেশ'-এ শিশুর আনন্দের কিছু উপাদান থাকলেও এগুলি মূলত নীতিপ্রধান। আবার কালিদাসের 'মেঘদূত' -এ আছে উদয়নের গল্প। এরপর মুসলিম শাসনের যুগে আরব্য-পারসিক সাহিত্যের সঙ্গে ভারতের পরিচয়ে ফার্সী কিসসারূপে এল 'গুলেবকাওলী', 'হাতেমতাই', 'বাহারদানেশ' প্রভৃতি গল্প। মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের পরে কেরীর 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থে ৮টি রূপকথাধর্মী গল্প পাওয়া যায়। এরপর বিদ্যাসাগর এসে 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি শিশুসাহিত্য রচনা করলেন।

এরপর ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা ' গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাহিত্যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। ছবির সংযোজন করে আনন্দরস দিয়ে ছোটদের জন্য এমন সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ রচনা এর আগে দেখা যায় নি। এরপর এলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর- যাঁদের আলোয় শিশুসাহিত্য এতদিনে নিজের পথ দেখতে পেল।

বাংলা সাহিত্যে ছোটদের রামায়ণ

লতিফা খাতুন (বাংলা অনার্স)

রামায়ণের কাহিনির সঙ্গে কম বেশি আমরা সকলই পরিচিত। ছোট বড় প্রায় সকলেই রামায়নের গল্প শুনতে ভালবাসেন।বড়রা ছোটদের ভূতের ভয় তাড়ানোর জন্য রামায়নের প্রসঙ্গ আনেন-

ভূত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি
রাম-লক্ষ্মণ সঙ্গে আছে,ভয় আমার কি।

আগে ছোটদের রামায়ণ ছিল না। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দও ছোটবেলায় বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়তেন।তখন ছোটোদের জন্য আলাদা করে রামায়ণ রচনা করতে হবে এ চিন্তা কারও মাথাতে আসেনি। তার কারন সম্ভবত ছোটদের অক্ষর জ্ঞানের অভাব ।সেই সময় কোনো নাটমন্দির বা বৈঠকখানায় বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রামায়ণ পাঠ হত।কখনও কখনও অভিজাত মানুষের বাড়িতেও রামায়ণ পাঠ হত।এছাড়াও যাত্রা গান , পালাগানের বিষয়ও রামায়ণ থেকে সংগ্রহ করা হত।ছোটরা সেখান থেকে শুনে শুনে রামায়ণ শিখত। এছাড়া তখনকার সময়ে পটচিত্র শিল্পী অর্থাৎ পটুয়ারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছবি দেখিয়ে রামায়ণ গান শোনাতেন। যা শিশুদের মধ্যে দৃশ্যশ্রাব্য রামায়ণ উপস্থিত করত।

শিশুপাঠ্য ছোটোদের রামায়ণ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে।বইটির নাম ছিল "সরল রামায়ণ" লেখকের নাম জানা যায় না। এছাড়া বহুজন বহুভাবে রামায়ণ লিখেছেন। যেমন-

বাল্যশিক্ষা : শিশুদের বিদ্যারম্ভের কথা ভেবে রামসুন্দর বসাক "বাল্যশিক্ষা"নামে একটি বই লেখেন।বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে।আগেকার দিনে শিশুদের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হতো চকখড়ি আর এই বই দিয়ে।বইটিতে মহারানি ভিক্টোরিয়ার ছবিসহ একটি অনুমতি পত্র ছিল।

হাসি ও খেলা : যোগীন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদিত"হাসি ও খেলা"১৮৯১সালেপ্রকাশিত হ য়। যেখানে আঠারো লাইনে একটা রামায়ণ রচনা করেন।বইটিতে বালকান্ড আর কিষ্কিন্দাকান্ড এক হয়েগেছে।

শিশু রঞ্জন রামায়ণ : প্রখ্যাতশিশু সাহিত্যিক নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'শিশু রঞ্জন রামায়ণ' ১৮৯২ সালে ৪১টি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয় ।বইটির কিছু কিছু জায়গাতে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঠিক করে দিয়েছিলেন।এবং কিছু জায়গাতে লেখকে সংশোধন করে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

টুকটুকে রামায়ণ : ২০০২ সালে বাল্মীকি অনুসারী কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের "টুকটুকে রামায়ণ" প্রকাশিত হয় । কথিত আছে যে বইটি "শিশু রঞ্জন রামায়ণের" পরিবর্ধিত রূপ। এই বই এর উদ্দেশ্য ছিল বাল্মীকির রামায়ণকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শিশু উপযোগী করে প্রকাশ করা।

ছেলেদের রামায়ণ : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধু রীর 'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে।বইটির সহজ সরল শিশু উপযোগী ভাষার ব্যবহার , বিষয়ের উপস্থাপনা এবং গল্প বলার সরসভঙ্গি এতটাই সুন্দর যে পড়তে গেলে মনে হয় পাশে বসে কেউ গল্প শোনাচ্ছে।যা শিশুসহ সাধার ণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছে। সেই সময় বইটি বহুল প্রচলিত ছিল। বইটির আকর্ষণীয় বিষয় হল এটি প্রথম গদ্য ভাষায় রচিত শিশুদের রামায়ণ।

ছোট্ট রামায়ণ : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আরও একটি বই 'ছোট্ট রামায়ণ', প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে।

ছোটোদের রামায়ন : যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটোদের রামায়ণ' প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে।সাতকাণ্ডের রামায়ন লিখেছিলেন তিনি।প্রতিটি কাণ্ড শেষ হওয়ার পর তিনি কয়েকটি অনুশীলন করেছেন।যেমন - শব্দ অনুশীলন , বিপরীত শব্দ, বানান শেখা, কাহিনি, গল্পঅনুশীলন, শূন্যস্থান পূরন ইত্যাদি।যোগিন্দ্রনাথ সরকারই বাংলা ভাষার প্রথম উদ্ভট ছড়াকার।

ছোটদের সচিত্র কৃত্তিবাস :কল্যাণী দত্তের "ছোটদের সচিত্র রামায়ণ" প্রকাশিত হয়১৯৪৭ সালে। কল্যাণী দত্ত এখানে সংকলক। তিনি কোথা থেকে সংকলন করেছেন তার কোনও উল্লেখ নেই।

ছোটদের রামায়ণ : পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী "ছোটদের রামায়ণ"প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে।

শিশু রামায়ণ : শ্রী নীলিমা ঘোষের ছয় কাণ্ডের "শিশু রামায়ণ" প্রকাশিত হয়১৯৫৭ সালে।

রামায়ণের কথা : বাল্মীকির রামায়ণের আদলে লেখা ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রীর "রামায়ণের কথা" প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। সরল গদ্যে সংক্ষেপে লেখা এই রামায়ণ পাঠক মহলে সেই সময় খুব সমাদৃত হয়েছিল।তাপস দত্তের আঁকা কিছু ছবিও বইটিতে ব্যবহিত হয়েছে।

ছোটদের রামায়ণ : ননীগোপাল চক্রবর্তীর লেখা "ছোটদের রামায়ণ " এ ছবি এঁকেছেন বিশিষ্ট শিল্পী চারুখান।

ছোটদের রামায়ণ : কথকতার ভঙ্গিতে সরল গদ্যে জ্ঞানরঞ্জন সেনগুপ্ত লেখেন "ছোটদের রামায়ণ " এই রামায়ণে একটি স্বপ্নের কথা আছে যা অন্য কোন রামায়ণে নেই।এখানেই এর বিশেষত্ব।

রামায়ণের রম্যরেণু : তারাপদ সরকারের "রামায়ণের রম্যরে ণু" শুরু হয়েছে রামচন্দ্রের প্রণাম জানিয়ে। তারপর যুক্ত হয়েছে ভূমিকা, পূর্ব কথা, তারপর আদি পর্ব।

রামায়ণিকা : সহজ সরল ভাষায় লিখিত কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের 'রামায়ণিকা' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে।

ছবিতে রামায়ণ : এমন কিছু কিছু রামায়ণ আছে যাতে লেখা কম ছবি বেশি।ফলে এই বই গুলি সবার প্রিয় হয়।পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর "ছবিতে রামায়ণ "। প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে।এই বইয়ের ছবি গুলি লেখক নিজেই এঁকেছেন।অসাধারণ সেই সব ছবিরবইয়ের চরিত্র।যা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সচিত্র রামায়ণ : ইন্দ্রনীল ঘোষের 'সচিত্র রামায়ণ' প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে।এখানেও লেখক নিজেই ছবি এঁকেছেন।

ছবিতে ছোটদের রামায়ণ : ননীগোপাল আইচ এর "ছবিতে ছোটদের রামায়ণ" এ ছবি এঁকেছেন গোসাই দাস পাল।বইটি খুললে আমাদের পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে যায়।

ছবিতে ছোট রামায়ণ : অজিত কুমার দাস এর 'ছবিতে ছোট রামায়ণ' এর ছবি এঁকেছেন দেবাশীষ মিত্র ও মিতা মিত্র।

আমরা জানি, সে সময়ে বটতলা ছিল বাংলা বইয়ের আঁতুরঘর।বটতলার প্রকাশকরাই বানিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে বই ছাপতেন।এবং বইয়ের প্রচার করতেন। বাঙালি ফেরিওলারা বই নিয়ে সারা বাংলা ঘুরতেন ।তাদের ঝুলিতে থাকত রামায়ণ, মহাভারত, নিত্যকর্ম পদ্ধতি, শিশু শিক্ষা জাতীয় বই।বটতলার রামায়ণে মধ্যে চলিত ভাষায় লেখা মিস মানসী হালদারের পঞ্জিকারবিজ্ঞাপন সহ 'ছোটদের রামায়ণ ' ও জি সরকারের 'গল্পে সচিত্র রামায়ন' এর নাম করা যায়।দুটোই ছোটদের রামায়ণ এবং দুটোই সচিত্র রামায়ণ। আমাদের আলোচিত রামায়ণের বাইরে আরও অনেক রামায়ন আছে।গল্পে মহাকাব্যে রামায়ণ, সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ইত্যাদি।

আমার বাংলা ভাষা

অধ্যাপক গোবিন্দমণ্ডল

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি"

কথাগুলি পড়লে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের কথা মনের মাঝে স্পষ্ট ছবির মত ভেসে ওঠে । মাতৃভাষার প্রতি আমাদের কতখানি আবেগ, কতখানি ভালবাসা, কতখানি আকর্ষণ সে কথা ভাবিয়ে তোলে । আমার জন্মদাত্রী 'মা'– তাঁর কোলে, হাসি কান্নার দোলা খেতে খেতে আমার বড় হওয়া ।এরপর মুখে বুলি ফোটা- মা– দা – দা – বা – বা এই শব্দগুলি।এই শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে আমার ভাষা শেখা। এই আমার মাতৃভাষা শিক্ষার ইতিহাস। যুগে যুগে এই ভাষাই নানান বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার মধ্য দিয়ে এসে ভাষার এক এক রূপ ধারণ করেছে ।বাংলা ভাষা জনসংখ্যার দিক থেকে পঞ্চম স্থান ও মাধুর্য্যের মধ্যে চতুর্থ স্থানাধিকারী ভাষা। সাহিত্যের দিক থেকেও এর স্থান উন্নত । নোবেল প্রাইজের অধিকারী হওয়া এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পূর্ব বাংলার বাঙ্গালীদের মত ভাষার প্রসার ও অধিকার স্থাপনে আমরা এখনও বেশ পিছিয়ে আছি ।মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব ।তখনও তাই অনেকে জিজ্ঞাসা করেন— "তুমি বাঙ্গালী – না খ্রীশ্চান?" অনেকের কাছে বাঙ্গালী শুধুমাত্র হিন্দুরা , আর খ্রীশ্চানরা বাঙ্গালী নয় । অজ্ঞতা কিছুটা এর কারণ হলেও এর কারণ যে আমরাই সৃষ্টি করছি সে কথা একটু ভেবে দেখলেই পেতে পারি।

আমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের সংস্কৃতি পশ্চিমী কায়দায় চালনা করতে ভালবাসি । আমাদের ছেলেমেয়েরা ইংরাজী মাধ্যম স্কুলে পড়লে যে বাংলা শিখবে না তা তো নয় , কারণ দিল্লী বোর্ডের স্কুলের ক্লাসে , দ্বিতীয় ভাষা বাংলায় অনেক খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা পড়ানো হয় ।বাংলা শিক্ষা পশ্চিমবাংলার বাংলা ভাষা শিক্ষার থেকে কোন অংশে কম নয় ।আসলে আমরা এই ভাষা শিক্ষা দিতে আগ্রহী নই ।ছোটবেলা থেকেই আমরা অনেকে ছেলেমেয়েদের 'মা' "বাবা' ডাক না শিখিয়ে 'মাম্মী'ড্যাডী, আংকল, এইসব ডাক শেখাই ।'মা' 'বাবা' যে কত মধুর ডাক এবং তা কত সহজে উচ্চারণ করা যায় যে ছেলেমেয়েরা এই ডাক নিজে নিজেই শিখে নেয় ।হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে কিম্বা আঘাত পেলে সবাই ওঃমা- ওঃ বাবা বলে ডাক দেয়। কেউ মাম্মী বা ড্যাডি বলে ডাক দেয় না। কষ্টের লাঘব মা বাবার মধুর ডাকে যেন দূর হয়। অন্য কোন ডাকে তা দূর হয় না । মাতৃভাষার প্রতিটি শব্দ আমাদের দেহ ও মনে জড়িয়ে থাকে।

ইংরেজ বা পর্তুগীজরা বা ডেভিস আগ্রাসনের সময় থেকে খ্রীষ্টান ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচার শুরু হয়েছে । অনেক মিশনারী এসে এদেশে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচার করে গেছেন ।তাঁদের আদর্শময় জীবন আমাদের আকৃষ্ট করেছে, তাছাড়া হিন্দুধর্মের কিছু কিছু গোঁড়ামী আমাদের ঐ ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করেছে । তাই তৎকালীন সময়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই মানবমুখী খ্রীশ্চান ধর্মকে জীবনে গ্রহণ করেছেন ।এই ধর্ম সকল গোঁড়ামীর উর্দ্ধে, স্বচ্ছ এবং কুসংস্কারমুক্ত।সেই সময় নানারূপ অন্যায় অতাচরের হাত থেকে বাঁচার জন্যও মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে ।এই সব ইতিহাস আমাদের অজানা নয় ।ধর্মের উদারতায় আমরা আকৃষ্ট হয়ে এই ধর্মপালন করছি বলে আমাদের বাঙ্গালীর যে রীতি রেওয়াজ (সংস্কৃতি যা না মানলেও চলে) আমরা প্রায়ই বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমী কায়দায় নিজেদের পরিচিত করে এটা ধর্মীয় রীতি বলে প্রচার করবো ? একদিন আমি শুনেছি আমার এক সহকর্মী আর একজন অন্যধর্মের সহকর্মীকে নিজের ধর্মের অর্থাৎ খ্রীশ্চান ধর্মের বিয়ের রীতি রেওয়াজ নিয়ে আলোচনা করছে। বিয়েতে মেয়েদের

গাউন পরতে হয়, বিয়ের পর কেক কাটা হয় এবং একটু করে বড়রা ওয়াইন খায় সে কথা বেশ ভালভাবে ব্যাখ্যা করছে।আমি তখন বলে উঠলাম্— "এই রীতি মেনে যারা চলেন তাঁরা বাঙ্গালী হলেও পশ্চিমী রীতি রেওয়াজ পালন করতে বিশেষ আগ্রহী।"

আমি আমার সেই বান্ধবীকে বললাম- "আমরা যারা বাঙ্গালী তারা বেশীর ভাগই আমাদের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করি ও তা পালন করি।মেয়েরা বিয়েতে শাড়ী পরে ও ছেলেরা ধূতি পাঞ্জাবী।এছাড়া কতরকম রীতি গায়েহলুদ, বধূবরণ যা যা পছন্দ তাই পালন করি।এই সব রীতি রেওয়াজ পালনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই ।তবে কেক কাটা ও ওয়াইন খাওয়া একেবারে পশ্চিমী কায়দা পছন্দ মত ও খুশীমত কেউ পালন করতে পারে , তবে খ্রীশ্চানদের এই নিয়ম পালন করতে হয় , তা ঠিক যুক্তি নয় ।জন্মদিনের কেক এখন সবাই কাটে , কিন্তু সেও তোমাদের সখে আমরা করি।"

আমরা যারা বাঙ্গালী কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত আমরা আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি যদি ঠিক রাখি এবং আমাদের আচার আচরণের মধ্যে আমার সংস্কৃতি প্রকাশ পায় তবে অন্য কারও মনে প্রশ্ন উঠবে না যে আমি খ্রীশ্চান কিন্তু আমি কি বাঙ্গালী ? ইংরাজী শিক্ষণ গ্রহণে আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের জীবনে উন্নতি লাভ করতে হয়তো সক্ষম হবে ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে যেন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকে সেদিকে তাদের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য ।সমাজে যারা পরিণত বয়স্ক ও বয়স্কা আছেন বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষিকা , তাদের প্রেরণায় ও পরিচালনায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন মাতৃভাষাকে চিনতে শেখে এবং সন্মান করতে শেখে। আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস যেন প্রত্যেকের জীবনে একটি বিশেষ দিন রূপে দেখা দেয় ।সবকিছুর মধ্যে থেকেও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে।

ভ্রমন সাহিত্য

হায়দ্রাবাদ ভ্রমণ

তানিয়া খাতুন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

দক্ষিণের অন্ধ্রপ্রদেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। ভারতের অন্যতম শহর হায়দ্রাবাদ। চারশো বছরের পুরানো অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী। রাজ্যের পরিবহন ও সংযোগ ব্যবস্থা খুব উন্নতমানের। এই জেলার বেশির ভাগই ঘন অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল। প্রাচীনকালে আত্রেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এখানে বাস করত , সম্ভবত তার থেকেই নাম হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। মৌর্য রাজাদের আমল থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ আলাদা স্বীকৃতি পায়। বিজয়নগরের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা রাম রায়। টালিকোটার যুদ্ধে ১৫৬৫ সালে পরাজিত হয়ে তিরুপতির নিকট চন্দ্রগিরিতে আশ্রয় নেয়। এরপর ১৫৯১ সাল হতে কুতুবশাহী সুলতানদের শাসনে চলে। এরপর মোঘল সম্রাটেরা গোলকুন্ডা দখল করার পর অন্ধ্রপ্রদেশে মোঘলদের শাসন আরম্ভ হয়। ১৭২৪ সালে থেকে নিজামশাহী শাসন আরম্ভ হয়। ইংরেজদের সাথে সন্ধি করে নিজাম নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয়। স্বাধীনতার পরও নিজামদের শাসন চালু ছিল। ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী অন্ধ্রকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

তারপর ভাষার দিক দিয়ে সৃষ্টি হলো তেলেগুভাষী রাজ্য। বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ ভাগ হয়ে ২০১৩ তেলেঙ্গনা রাজ্যের জন্ম হয়। দুই রাজ্যের রাজধানী হায়দ্রাবাদ রয়েছে। ঐতিহাসিক শহর হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদ আর সেকেন্দ্রবাদকে একসাথে বলা হয় টুইন সিটি। ইতিহাসের সাথে সংশ্রিমণ ঘটেছে এখানে। সেকেন্দ্রবাদ , হায়দ্রাবাদ ও কাচিগুড়া তিনটি রেল ।আধুনিক মহানগরী তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে এই শহরকে পৌঁছে দিয়েছে সর্ব প্রথমে। হায়দ্রাবাদ শহরে দর্শনীয়-চারমিনার-চারশো বছরের পুরানো অনেক সুখ-

দুঃখের সাক্ষী, নির্মাণ, করেছিল মহম্মদ কুলি কুতুবশাহ।রামোজী ফিল্ম সিটি , কাবা মসজিদ , নবাব প্যালেস, সালারজং-মিউজিয়াম- সারাপৃথিবীর মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন স্থাপত্যের এক ভাস্কর্য শৈলীর নানা নিদর্শন সংরক্ষিত হচ্ছে। অজন্তা প্যাভেলিয়ান- আর্কিওলজি ক্যাল মিউজিয়ামের পাশেই এই প্যাভেলিয়ান। শহর থেকে ১৪ কিমি. দূরে গোলকুণ্ডা দুর্গ। হিম্মত সাগর , হোসেনসাগর, ওসমান সাগর প্রভৃতি। হায়দ্রাবাদ শহর থেকে একটু দূরে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম শ্রী শৈলমে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকার্জুন। এখানে কোনও ধর্মের ভেদাভেদ নাই। এখানে এসেছিলেন শঙ্করাচার্য্য , শ্রীচেতন্যদেব। সতীদেবীর ৫১পীঠের এক পীঠ শ্রীশৈলম। শ্রীশৈলম থেকে ৮ কিমি. দূরে স্বন্নিপেন্টা। আছে ভারতের বৃহত্তম অভয়ারণ্য রাজীবগান্ধী ব্রাঘ্র প্রকল্প। বোটানিক্যাল গার্ডেন , নৌবত পাহাড়, লুম্বিনি পার্ক-হোসেন সাগর লেকের পাড়েই এই সুন্দর পার্কটি। এছাড়া দক্ষিণের শ্রেষ্ঠ তীর্থ তিরুপতি দর্শন করা যায়। দূরত্ব ৫৯২ কিমি.।

কি ভাবে যাবেন ? হাওড়া থেকে ট্রেন ইস্ট কোস্ট Ex, ফলক নামা Ex. এছাড়া আরো ট্রেন আছে। বিমান যোগাযোগ আছে।

বারুইপুরের খুঁটিনাটি

অধ্যাপক আজমিরা খাতুন (বাংলা বিভাগ)

কলকাতা থেকে বাসে অথবা শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে ডায়মন্ডয় বা নামখানা লোকালে আসা যায় বারুইপুরে। বারুইপুর এই নামের পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

যারা পান চাষ করেন তাঁদের বারুজীবী বা বারুই বলা হয়। অতীতে বহুসংখ্যক বারুইদের বসবাসের কারণে জায়গাটির নাম বারুইপুর হয় বলে মনে করেন অনেকে। 'বর' কথাটির অর্থ পান। মধ্যযুগে এখানে ও তার আশেপাশের গ্রামে প্রচুর পান চাষ হত। বহু প্রাচীন এই অঞ্চলটি আদিগঙ্গার ধারে গড়ে উঠেছিল। ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত বিপ্রদাস পিপলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বারুইপুরের উল্লেখ আছে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' বাব্যেও বারুইপুরের নাম রয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভু বারুইপুরের কাছে আটিসারা গ্রামে এসেছিলেন বলে জানা যায়। ইংরেজ রাজত্বে অনেক খ্রিস্টান মিশনারি এখানে থাকতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুরের ডেপুটি নাজিস্ট্রেট ছিলেন। এখানেই তিনি দুর্গেশনন্দিনী লেখেন। বারুইপুর কোর্টে মইকেল মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

এখন বারুইপুর ব্যস্ত মহকুমা শহর ।এই শহরে এবং শহরের আশেপাশের কিছু দেখার জায়গা আছে । এক ঝলকে সেগুলি দেখে নেওয়া যায়। বারুইপুরে মহকুমা হাসপাতালের কাছে রয়েছে সেন্ট পিটার্স গির্জা ।১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান মিশনারি রেভারেন্ড ডিব্রারেজ ও দ্য প্রপোগেশন অফ গসপেল নামে একটি সংস্থার চেষ্টায় এই প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি সিএনআই ভুক্ত। ৬০০ আসন বিশিষ্ট এ চার্চটি ১৯৬৬ সালে সংস্কারের পর অনেক পরিবর্তিত হলেও এখনও ৫ প্রাচীন চার্চটি অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বারুইপুরে ক্যাথিলিক চার্চ রয়েছে ঋষি বঙ্কিমনগরে।

এছাড়া রবীন্দ্র ভবন একটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র। তার পাশেই আছে সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা যেখানে অতীতের অনেক প্রত্নসম্পদ রয়েছে। এটি দেখলে অতীতের বারুইপুরকে জানতে সুবিধা হবে। রবীন্দ্র ভবনের পাশে ও রাসমাঠের কাছে জমিদার রায়চৌধুরীদের দুটি বসত এলাকা। কথিত আছে , ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে রাজবল্লভ রায় রাজপুর থেকে বারুইপুরে এসে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পুরাতন বাজারের কাছে বিশাল রায়চৌধুরী ভিলা প্রতিষ্ঠা করেন।

রবীন্দ্র ভবনের পাশে রায়চৌধুরীদের জমিদার বাড়িটি দ্বিতল। এলাকায় এই বাড়িটি বড়কুঠি নামে পরিচিত। সেই সময় বারুইপুর নীল চাষ ও নমক তৈরির কেন্দ্র ছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে এই নমক বিভাগের কালেক্টর ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। এটি ইংরেজদের কাছ থেকে দ্বারকানাথ কিনে নেন। পরে রায়চৌধুরীরা কেনেন। ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের বিশেষ প্রভাব আছে বাড়িটিতে। রোয়াকে কুড়ি ফুট উঁচু টাস্কান স্তম্ভ , পেডিমেন্ট অর্ধগোলাকার খিলান, পঙ্খের ফুলকারি ও অলংকরণ বেশ চমৎকার। বসতবাড়ির সামনের বাড়ি বরগার দুর্গাদালানটিতে পঙ্খের অলংকরণের কাজ রয়েছে। দুর্গাদালানের পেছনে রায়চৌধুরীদের বসতবাড়ির করিন্থিয়ান পিলারের সৌন্দর্য দেখার মতো। এছাড়া বাড়ির ভেতরে আরও একটি বড় দুর্গাদালান রাজকুমার রায় ১২৮০ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও এখানে দুর্গাপূজা হয়। এই বাড়ির পেছনে বড় দিঘিটিও দৃষ্টিনন্দন। বাড়িটি বর্তমানে রায়াচীধুরীদেরই আছে।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে পুরাতন বাজারের কাছে সুবিশাল জমিদারবাড়ি তৈরি করেন রাজবল্লার রায়। এটিই রায়চৌধুরীদের প্রাচীন প্রথম বাড়ি।এখানেই তিনি জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশাল জমিদার বাড়ির ফটক ,বাড়ি, দেউড়ি ও বৃহৎ ঠাকুরদালানটিতে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের নিদর্শন হয়েছে। জমিদার রায়চৌধুরীদের পারিবারিক কুলদেবী মা আনন্দময়ী। জমিদার বাড়ি তৈরি হলে রাজপুর থেকে দেবীকে এখানে আনা হয়। আজও কালো পাথরের এই বিগ্রহটি এই বাড়িতে পূজিত হয়। ঠাকুরদালানে প্রাচীন দূর্গা পুজা হয়। বাড়ির সামনে আটচালা শিব মন্দির ও কিছু দূরে দোলতলায় সুউচ্চ চারচালা দোলমঞ্চ আছে। রায়চৌধুরীদের রথ ও তার মেলা বারুইপুরের গর্ব। কাঠের রথটি বহু প্রাচীন। অনেকবার তার সংস্কার হয়েছে।

বারুইপুরে কাছারি বাজারের পাশে বিশালাক্ষীতলায় দেবী বিশালাক্ষী মন্দির। দেবীর আধুনিক দালানমন্দিরে একটি বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হচ্ছে। কালো পাথরের প্রায় দেড় ফুট উচ্চতার এই বিষ্ণুমূর্তিটি আনুমানিক পাল যুগের বলে অনেকে মনে করেন। এছাড়া সাহাপাড়ায় সাহাদের দুর্গামণ্ডপ , রাসমান ও ফুলতলার মাঝে রায়বর্মণদের আটচালা শিব মন্দিরটি উৎসাহীর দেখে নিতে পারেন। কাছারি বাজারের মাঝে রয়েছে কাছারিবাজার জামে মসজিদ।এখান থেকে অটোয় একটু এগিয়ে গেলে যোগীবটতলা। সেখানকার ডিহিমদনমল্ল গ্রামে বিশালাক্ষী মন্দির দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পড়ে।

আটিসারা । অনন্ত পন্ডিতের শ্রীপাটের জন্য আটিসারা গ্রাম বিখ্যাত হয়ে আছে। বারুইপুর স্টেশন থেকে অটোয় সহজেই যাওয়া যায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদের সপার্ষদ আদি গঙ্গার স্রোত ধরে পুরীতে জগন্নাথদেবের কাছে যাবার সময় অনন্ত পণ্ডিতের কাছে আসেন ও নামকীর্তনের মধ্যে এক রাত অতিবাহিত করেন।

৮৩৮ বঙ্গাব্দে বা ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে আদিগঙ্গার তীরে কীর্তনখোলা শ্মশানঘাটের কাছে মহাপ্রভুর সঙ্গে অনন্ত পণ্ডিতের দেখা হয়েছিল। কীর্তনখোলার সামনে মহাপ্রভূতলায় বর্তমানে মহাপ্রভুর মন্দির ও অনন্ত আচার্যের শ্রীপাট রয়েছে। মূল মন্দিরে প্রাচীন গৌর-নিতাইয়ের মূর্তি পূজিত হচ্ছে। এখানে মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন রয়েছে। এছাড়া মন্দিরে শিব-পার্বতী-সহ বহু দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। আশ্রমে প্রতিদিন ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা আছে। ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা তিথিতে এখানে বড় উৎসব হয়। মন্দির নতুন হলেও প্রাচীন এই স্থানটি দেখে নেওয়া যায়।

মহাপ্রভূতলা থেকে কিছু পথ গেলে বাঞ্ছারামের বাগান নামে একটি বাগান জনপ্রিয় হয়েছে 'বাঞ্ছারামের বাগান' সিনেমা তৈরি হওয়ার পর। নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্রর 'সাজানো বাগান' নাটক থেকে ছবি তৈরি করেছিলেন পরিচালক তপন সিনহা। ছবির শ্যুটিং এই বাগানে হয়েছিল। এখানে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগবে।

বারুইপুরের বিখ্যাত পেয়ারাবাগান-সহ অনেক সুদৃশ্য বাগান এখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। লিচু , পেয়ারা, জামরুল ও সবেদা চাষ হয় এখানকার অনেক জায়গায়। বিশেষ করে বারুইপুরের জন্যই এইসব ফলের স্বাদের খ্যাতি আছে।তবে দ্রুত পরিবর্তনের ফলে আগের মানচিত্র পালটে যাচ্ছে।

বিশেষ রচনা

আমাজন

রহিনা খাতুন (বাংলা)

আমাজনের কথা প্রথম যখন শুনি তখন আমি অনেক ছোট। সেই থেকে স্বপ্নে ছবি আঁকি। আমার কল্পনায় আমাজন এক গহীন অরণ্য। দুর্ভেদ্য। যেখানে গাছের পাতা ভেদ করে সূর্যা লোকের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে বিচিত্র সব পশু-পাখি-পতঙ্গকুল।যারা সংখ্যায় অজস্র। সে জঙ্গলে কেউ একবার ঢুকে পড়লে , পথ হারানো নিশ্চিত। অতিকায় হাতির পিঠে চেপে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় টার্জানের মত মানুষরা। জঙ্গলের ফল-মূল আর নদীর মাছ খেয়ে চলে জীবন। তারা রক্ষা করে এই জঙ্গলকে জলদস্যুদের হাত থেকে। এই বর্ষাবনে নাকি সঞ্চিত আছে বিপুল রত্নসম্ভার। ছোট বেলাকার কৌতূহল তো , অনেক জিজ্ঞাসা, তার মধ্যে একটা ছিল , কত বড় এই অরণ্য ? তখন আমি ছয়-সাত। বাবা মার সাথে সুন্দরবনে গিয়েছিলাম। চারদিন ছিলাম। দু-বেলা নৌকা চেপে ঘুরেও জঙ্গলের অনেকটা নাকি দেখাই হয়নি। আমার ধারণায় তখন এর চাইতে বড় জঙ্গল আর হতেই পারে না। আমাজন যত বড়ই হোক, তাকে ছাড়াতে পারে না কোনোমতেই পারে না।তারপর বড় হয়ে দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে যা সামনে এল, তাতে তো আমি ভেবেই অবাক! আমাজনের বর্ষাবনেই নাকি ঠাঁই হতে পারে বাষট্টিটা পশ্চিমবঙ্গের। অববাহিকা অঞ্চল ধরলে আরও বেশী। বিশ্বাস হচ্ছে না তো ? তবে ভেঙেই বলি। একেবারে অঙ্কে। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন ৮৮ ,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার। সে জায়গায় আমাজন বর্ষাবনের ৫ ,৫০০,০০০ বর্গকিলোমিটার। অববাহিকা অঞ্চল ধরলে ৭,০০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

আমাজনের এই অরণ্যে দুটো ঋতু। বেশী বর্ষা আর কম বর্ষা। বিশাল এই জঙ্গলের ভেতরে রয়েছে নটা দেশের অংশ- ব্রাজিল, পেরু, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা, কলম্বিয়া, বলিভিয়া, গায়ানা, ফ্রেঞ্চ গায়ানা আর সুরিনাম। এর ভেতর ব্রাজিলের ষাট শতাংশ। তার পরই পেরু-তেরো শতাংশ। কলম্বিয়া-দশ শতাংশ , বাকি দেশেদের অংশ থাকলেও তেমন উল্লেখ করবার মত নয়। আমাজন নদী , তার দু-পাশে দিগন্ত বিস্তৃত এই জঙ্গল। বছরের বেশীটা সময়ই বৃষ্টি। শুধুমাত্র আগস্ট আর সেপ্টেম্বরে কম বর্ষা। গড় তাপমাত্রা ২১-৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সারা দক্ষিণ আমেরিকার চল্লিশ শতাংশ জুড়ে রয়েছে এই বৃষ্টি অরণ্য। সাজানো ষোলো হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি দিয়ে। লতা থেকে গুল্ম-বৃক্ষ-ছত্রাক কত যে রকম আছে তার ঠিক নেই।

এমন গাছ, যা অন্য কোথাও মেলে না- Amazon cedar, Brazil nut শুধুমাত্র এখানকারই। এখানকার বন আলো করে থাকে Mahagony, Rose Wood, Palm, Laurel, Giant Water Lily, Passion Flower, রঙ-বেরঙের Orchid বা coffe plant। সিন্থেটিক রবার আবিষ্কারের আগে এ জঙ্গলে চলত গাছ থেকে রবার সংগ্রহ। অন্যান্য গাছ কেটে তৈরি হচ্ছিল রবার বাগিচা। পৃথিবীতে মেলা এবং আবিষ্কৃত প্রতি দশটা জীব প্রজাতির একটার ঠিকানা আমাজন। পাঁচটার ভেতর একটা পাখি থাকে এই আমাজনে আমাজনে পাওয়া যায় ৪২৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রায় ১৩০০ প্রজাতির পাখি , ৩৭৮ প্রজাতির সরিসৃপ, ৪০০ প্রজাতির উভচর, ২৫,০০০০০ (পঁচিশ লক্ষ) প্রজাতির কীট- পতঙ্গ , এছাড়া নদীতে মেলে প্রায় ২ ,২০০ প্রজাতির মাছ। এখানে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বাঁদর- পিগমি মারমোসেট, Gold- Lion-Tamarin(সিংহ-মুখো বাঁদর), Sloth, Bald Uakari, তীব্র চীৎকার করা Howlar Monkey, South American Tapir, Jaguar, Armadillo, Vampire Bat, Giant Ant -eater,

পাখিদের মধ্যে অনন্য Scarlet Macaw, Toucan, Harpy Eagle, Black Caiman, উভচরদের মধ্যে বিশিষ্ট Poison Dart Frog, Giant Leaf frog, সরিসৃপদের ভেতর সাড়া জাগানো Anaconda, Green Lizard, Jesus Lizard,

Green Iguana আর জলে চলে Giant otter, Amazonian Manatee, Amazon River Dolphin থেকে Electriceel।Electric eel। আমাজনের এই বর্ষা-বন প্রায় পঞ্চাশটি আদিবাসী -গোষ্ঠীর দু-কোটি মানুষের বাস। এদের অনেকেরই জানা নেই জঙ্গ লের বাইরের পৃথিবীটা কেমন। এই জঙ্গলই ওদের অন্নদাতা-ওদের আশ্রয়।

সারা পৃথিবীর মোট বর্ষাবনের অর্ধেকটাই আমাজনের ভাগে। সেখানে গাছের ঘনত্ব এতটাই যে গাছের মাথায় বৃষ্টি পড়লে তা চুঁইয়ে মাটিতে নামতে প্রায় দশ মিনিট সময় লাগে। গাছেদের ভেতর শিম্বজাতীয় (Leguminous) গাছের আধিক্য। এসব গাছের ফল প্রোটিনে ভরপুর। পুষ্টি যোগায় বনের পশু-পাখি থেকে আদিবাসী-সব্বাইকে। এছাড়া এ জঙ্গলে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের ঔষধি গাছ Medicinal Plant। প্রচুর পরিমাণে।

এ জঙ্গলের জান আমাজন নদী ও তার শাখা-উপশাখা। সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয় , আবার শ্বসনের ভেতর দিয়ে গাছেরাও জল ছাড়ে বাতাসে। এই জলীয় বাষ্প ওপরে উঠে তৈরি করে জল ভরা মেঘ। গাছেদের মাথায় ধাক্কা লেগে আবার নেমে আসে বৃষ্টি হয়ে। নিয়ন্ত্রণে থাকে তাপমাত্রা। বিজ্ঞানীদের হিসেবে আমাজন বর্ষা-বনের মাটিতে জমা আছে ৯,০০০ থেকে ১৪,০০০ কোটি টন কার্বন। দাবানলের ধাক্কায় এই কার্বন যদি কার্বন ডাই অক্সাইডে পাল্টে যায়, সঙ্গে বাতাসে দেখা দেয় কার্বন-মনোক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস , তাহলে ছবিটা যে কী হবে চিন্তাই করা যায় না। এর সাথে জুড়তে হবে আরও একটা জরুরি কথা-সারা পৃথিবীর অরণ্য যত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে তার বিশ শতাংশই দেহে ধারণ করে এই বৃষ্টি বন। এজন্য এ বনের আর এক নাম Natural Sink। Global warming নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাই এ বনের গুরুত্ব এত। অসাধারণ এই বৃষ্টিবনের ইকো-সিস্টেম বা বাস্তু-তন্ত্র এতটাই উঁচু তারে বাঁধা যে , সামান্যতম বদলেও ঘটে যেতে পারে বড় বিপর্যয়। মাত্র তিন ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লেই ৭৫ শতাংশ খতম হয়ে যেতে পারে এই আমাজন বৃষ্টি বন।

আমাজন পৃথিবীর ফুসফুস, মানুষের শেষ আশ্রয়।একথা জানেন সবাই। সব দেশ। দুনিয়ার মোট অক্সিজেনের পাঁচ ভাগের এক ভাগই আসে এই বৃষ্টি-বন থেকে , অথচ তাকেই জ্বালিয়ে শ্মশান বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাজন বৃষ্টি বনের বেশিটাই ব্রাজিলে। গত কয়েক দশক ধরে লুঠ-পাট সেখানেই হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে প্রায় আট লক্ষ বর্গকিলোমিটার । প্রতিবাদ হয়েছে দেশের ভেতরে , দেশের বাইরে। চেকো মেন্দেসের মত পরিবেশবিদকে প্রাণ দিতে হয়েছে নিজেরই দেশে লুঠেরাদের হাতে। বর্তমান পরিস্থিতি প্রায় হাতের বাইরে।আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই অক্সিজেন ভাণ্ডারকে বাঁচিয়ে রাখা।

অমুসলিমদের সঙ্গে আচরণে কেমন ছিলেন বিশ্বনবী সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

জামিলা খাতুন(আরবি)

ইসলাম শান্তির ধর্ম ।এ ধর্মে আছে প্রেম ভালবাসা দয়া ও অনুগ্রহ ইসলাম নিজ ধর্মেদের মানুষদের যেমন সম্মানের চোখে দেখে ঠিক অন্য ধর্মের মানুষকে ও মানুষ হিসেবে সম্মানের যোগ্য মনে করে ।ইসলাম অমুসলিমদের ধর্ম স্বাধীনতা দেয় ।শুধু ধর্মীয় স্বাধীনতাই দেয়নি , তাদের সঙ্গে সামাজিক অংশীদারি ,সৌজন্যবোধ ও মেলামেশা করতেও নিষেধ করেনি।

ইসলাম এমন জীবন ব্যবস্থা ,যার বিশ্ব সমাজ গড়ে তোলার সব উপদান মাধুর্য আছে । নবী সল্লাল্লোহু ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ থেকে আমরা অনুপম আদর্শের শিক্ষা পাই, তার মর্যাদা যেমন , আচার আচারন ও পারিপার্শ্বিকতাও তেমন। মহান আল্লাহ তাআলা যেখানে বিশ্বনবী সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্ককে এত প্রশংসাও ও গুণ বর্ণনা করেছেন, সেখানে অমুসলিমদের প্রতি বিশ্ব নবীর আচরণ কেমন হবে ?

আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমের প্রিয় নবী সল্লাল্লোহু ওয়াসাল্লাম এর যে সব গুণ ও মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন তা হল - আর আমি আপনার আলোচনাকে সুউচ্চ করেছি ,(সূরা আলাম নাশরাহ আয়াত ৪)-

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি। (সূরা আম্বিয়া আয়াত১০৭)

আপনি সেই মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ,যাকে আমি বিশ্ব মানবতার জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি ।কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তা জানে না।(সূরা সাবা আয়াত নাম্বার ২৮)

এসব কারণেই মহান আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তম চরিত্র দিয়ে মানবতার মুক্তির দূত করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন । যিনি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এত গুণ ও মর্যাদার সনদ পেয়েছেন ,মানুষের প্রতি তার আচরণ কেমন হবে ?

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লোহু ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রতি ছিলেন উদার। ধর্ম বর্ণ জাতি গুষ্টি বিচারে তিনি কারোর প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করেনি । কারোর প্রতি অবিচার করেননি । এমনকি তার উম্মতের সবার উদ্দেশ্য এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন- যেন কেউ কারও প্রতি জুলুম ও অন্যায় না করে । যেন সবার সঙ্গে উত্তম সদাচার করে।

বিশ্বনবী সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদের অধিকার রক্ষার ঘোষণা করেছেন।

কোন মুসলিম যদি অমুসলিমদের প্রতি অবিচার করে তবে বিচারের দিন অমুসলিমদের পক্ষে অবস্থান নেবেন ।

হাদিসে এসেছে হযরত সুফিয়ান ইবনে সালিম রাদিয়াল্লাহু তা 'আলা আনহু বর্ণনা করেন , রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লোহু আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন - জেনে রেখো কোন মুসলমান যদি অমুসলিম নাগরিকের উপর নির্যাতন নিপীড়ন করে কোন অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে তার কোন জিনিস বা সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেয় তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারে কাঠগোড়ায় আমি তাদের বিপক্ষে অমুসলিমদের পক্ষে অবস্থান করবো ।(আবু দাউদ শরীফ)

প্রিয় নবী সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদের জান ও মালের উপর হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন । কারণ এর পরিণতি হবে জাহান্নাম ।

হাদিসে এসেছে হযরত আবু বকর রাদি আল্লাহু তা 'আলা আনহু বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন ' যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন ,(মুসনাদে আহমেদ)

উল্লেখিত হাদিসে থেকে বোঝা যায় কোন অমুসলিমদের প্রতি অন্যায় ভাবে অত্যাচার নির্যাতন এমনকি খারাপ আচরণ ও করা যাবেনা ।কেননা দুনিয়ার বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম ।আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হলো সবার সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ করা । এ কারণেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মর্মে সতর্ক করেছেন যে তোমরা মজলুমের বদ দোয়া থেকে বেঁচে থেকো যদি ও সে অমুসলিম বা কাফের হয় কেননা কোন মজলুমের মাঝে আর আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকেনা।(মুসনাদে আহমদ)

অমুসলিমদের প্রতি মুসলমানদের আচার আচরণ কেমন হবে তার বহু হাদিস আছে তার মধ্যে একটা দৃষ্টান্তমূলক এখানে উল্লেখ করলাম - প্রিয় নবী সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিমদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন উত্তম আচরণ করেছেন । তার উম্মতের প্রতি ভালো আচরণ করার নির্দেশ ও দিয়েছেন হাদিসে এসেছে হযরত আসমা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন - আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলাম - আমি কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব ? বিশ্বনবী সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন – 'হ্যাঁ।' (বুখারী শরীফ)

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সম্মান করেছেন । হোক সে মুসলিম কিম্বা অমুসলিম বৈদ্য হিন্দু ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান।

হাদিসে এসেছে একবার বিশ্বনবী সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দিয়ে একবার এক ইহুদী লাশনিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর এতে ওই লাশের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন ।তখন হযরত যাবির রাদিআল্লাহু তা 'আলা আনহু বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ !এটাতো ইহুদির লাশ তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লোহুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ' সে কি মানুষ নয় ?, (বুখারী শরীফ)

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত কারি তিনি কারোর প্রতি কোন ধরনের পক্ষপাত মূলক আচরণ করেন নি ।অন্যায় ভাবে কোন মুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করেনি ।

মানুষ হিসেবে তিনি সবার প্রতি ছিলেন উদার ও উত্তম আচরণকারী ।প্রতিবেশী যেই হোক অর্থাৎ মুসলিম কিংবা অমুসলিম তার অধিকারের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন ।

সুতরাং মুসলিম জাতির উচিত বিশ্বনবী মুহাম্মদ সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদার নীতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া ।ইসলামের সুমহান আদর্শ গুলো গ্রহণ করা ।বিশ্বনবী মুহাম্মদ সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরা ।আর তাতে মুসলিম অমুসলিম সব মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে বিশ্ব নবীর সুমহান আদর্শ ।

আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে অমুসলিমদের সঙ্গে আচার -আচরণ-এ বিশ্বনবী মুহাম্মদ সল্লাল্লোহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকনির্দেশনা মেনে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন । হাদিসের উপরে যথাযথ আমল করার তৌফিক দান করুন । (আমীন)

শিক্ষক দিবস এবং ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

নজরুল মণ্ডল (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী । তাঁর শিক্ষাব্রত মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না ।সমস্ত বিশ্বই ছিল তার বিরাট ক্ষেত্র ।তার জীবনে ভারতের প্রাচীন মনীষার সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞান গরিমার অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল ।তার বহুমূল্য গ্রন্থাবলী এই মহামিলনের কৃতফল ।প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করেও তিনি ভারতের রাজনীতির সর্বোচ্চ পদ রাষ্ট্রপতি রূপে পরমসম্মান লাভ করেছিলেন । তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী অথচ বিনয়ী, সর্বোচ্চ প্রশাসক অথচ নিরহঙ্কার, বিশ্বনন্দিত অথচ সৌজন্যের প্রতীক। তিনিই দেখিয়েছেন কীভাবে সরল জীবন যাপনের সঙ্গে উচ্চচিন্তার সহাবস্থান সম্ভব।

এই মহান শিক্ষকের জন্মদিন ৫ই সেপ্টেম্বর ।স্বাধীন ভারতের প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেই একজন শিক্ষাব্রতী ও শ্রেষ্ঠ দার্শনিককে ১৯৬২ সালের ১৩ই মে রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করে নেওয়া হয়।তাই ১৯৬২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর থেকেই এই দিনটি শিক্ষক দিবস রূপে পালিত হয়ে আসছে। এই দিনটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গুলিতে সমারোহের সঙ্গে 'শিক্ষকদিবস' পালন করা হয়।প্রতি বৎসর ভারতের রাষ্ট্রপতি মনোনীত কৃতী শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কার প্রদান করে থাকেন ।ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের বিশেষ পরিচিতি তবে পাগড়ী পরিহিত শান্ত সুন্দর অবয়বের জন্য। তিনি ১৮৮৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ প্রদেশের থিরুত্তানি নামক এক ক্ষুদ্র শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের প্রথম আটবৎসর থিরুত্তানি শহরেই অতিবাহিত হয় ।দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান তিরুপতি শহরের লুথেরান হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন।এরপর মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজ হতে দর্শন শাস্ত্র সাম্মানিক ডিগ্রিসহ উত্তীর্ণ হন।এরপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে দর্শন শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। শুধু তাই নয় প্রথম স্থান অর্জন করে 'স্যামুয়েল সাথিয়ানাথন' স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

অতঃপর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন । ভারতীয় দর্শনকে এক সকীয় আসনে বসানোর জন্য তিনিই সর্বপ্রথম সচেষ্ট হন। কেননা তখনও পাশ্চাত্য দর্শনই ছিল তার মুখ্য পাঠ। তিনি উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র ইত্যাদি প্রাচীন শাস্ত্র গুলির উপর শঙ্করাচার্য , রামানুজাচার্য, মাধবাচার্য প্রমুখের ভাষ্যগুলির জনপ্রিয় করতে সচেষ্ট হন ।বঙ্গ এবং বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্গে তার এক নিবিড় সংযোগ গড়ে ওঠে তাঁর ছাত্রাবস্থা হতেই। ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বধর্ম সম্মেলনের বক্তৃতা এবং মানবতার আলোকে বিশ্বজয় তাকে মুগ্ধ করে।তখন থেকে তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন ।১৯১৩ খ্রী: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি এবং সারা ভারতবর্ষ যখন রবীন্দ্র বন্দনায় উত্তাল তখনই তিনি গীতাঞ্জলীর অনুবাদ পাঠ করেন।রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ অনুরাগী রূপে , রবীন্দ্রজীবন দর্শনের সঙ্গে প্রাচীন আধ্যাত্মবাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে দুটিপ্রবন্ধ রচনা করেন।১৯১৮ সালে তিনি 'Philosophy Of Rabindranath Tagore' গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং এই সময় উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ।রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎ ১৯৪০ সালে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে ডি .লিট প্রদানের অনুষ্ঠানে।কর্মসূত্রেও তিনি বঙ্গজীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তিনি হলেন দর্শন বিভাগের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক তথা প্রধান অধ্যাপক ।এই সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বিশেষ হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।শিক্ষাক্ষেত্রে তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি তাকে এক অনন্য

সাধারণ মর্যাদায় ভূষিত করেছে ।১৯২৯ খ্রী: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ম্যাঞ্চেস্টার কলেজের অধ্যক্ষরূপে আসীন ছিলেন ।তিনি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হারভার্ড প্রিন্সটন, চিকাগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বিপুল জনপ্রিয়তা পান ।১৯৩১-৩৯ সাল পর্যন্ত লীগঅব নেশানস্ এর সদস্য ছিলেন ।১৯৩৭ সালে 'স্যার' উপাধি পান ।তবে স্বাধীনতার পর তিনি তা ত্যাগ করেন ।সেই সঙ্গে 'ফেলো অব দ্য রয়্যাল অ্যাকাডেমি''র অতি সম্মানজনক সদস্য মনোনীত হন । ১৯৪৯ সালে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর দেশ রাশিয়াতে তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে। সোভিয়েত পলিটব্যুরো রাধাকৃষ্ণণকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপেও নিয়োগ করেছিল।১৯৪২ সালে রাশিয়া হতে ফিরে আসার পর তিনি ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপতি পদেও নির্বাচিত হন।তার কার্যকালের মধ্যেই ১৯৫৪ সালে ভারতরত্ন উপাধি লাভ করেন।অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, বিরল সম্মানেও ভূষিত ব্যতিক্রমী এই মানুষটি শুধুতাঁর শিক্ষাজগতের মধ্যেই নিবিষ্ট থাকেন নি ।তিনি দেশেরও বিশ্বের চলমান ঘটনা প্রবাহের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন ।মানুষের থেকে দূরে অবস্থান করেন নি।শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি , নিজের আদর্শকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন তিনি রাষ্ট্রপতির ধার্য বেতন ১০ হাজার টাকার পরিবর্তে মাত্র ২ হাজার টাকা গ্রহণ করতেন কারণ তিনি অধ্যাপক থাকাকালীন সময়ে সেই পরিমাণ অর্থবেতন পেতেন।এবং অতিরিক্ত অর্থ দেশ গঠনের কাজে ব্যয় করার নির্দেশ দেন।তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের জীবনের একটি মাত্রই আদর্শ , তা হল নিজেকে পূর্ণমানুষের পর্যায়ে উন্নীত করা ।তাই বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষটি নিপীড়িত জনগণের পরম শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন ।তবে এই ধর্মীয় উদারতা আজকের রাষ্ট্রীয় জীবনে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ।রাধাকৃষ্ণণকে পোপ ষষ্ঠ পল তার নিজের বাসভবন ভ্যাটিকান সিটির সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি ভ্যাটিক্যান পদক প্রদান করেন ।তাই শিক্ষক দিবসে শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী উভয়কেই রাধাকৃষ্ণণের জীবনচর্চা অনুশীলন করতে হবে। ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তারা আদর্শ জীবনযাপনের প্রেরণা পায়।সুন্দর দেশ ও জাতি গঠিত হয় ।

আবুবকর (রা.) সংকলিত কোরআনের বৈশিষ্ট্য

কারিমা খাতুন (আরবি)

আবু বকর (রা.) সংকলিত কোরআনকে পরিভাষায় 'উম্ম' বা আদি কোরআন বলা হয়।কেননা এটিই প্রথম লিখিত সুবিন্যস্ত কোরআন।এর বৈশিষ্ট্য হলো -এটি রাসুল (সা.) বর্ণিত ধারাক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে ।সুরাগুলো আলাদা রেখে দেওয়া হয়েছে; সুরার ক্রমধারা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি।এটি সাত হরফ বা সাত কেরাতে লেখা হয়েছে।এ কপিটি হীরার হস্তাক্ষরে লেখা হয়েছে।এখানে কেবল সেসব আয়াত লেখা হয়েছে, যেগুলোর তিলাওয়াত রহিত হয়নি।এই সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল একটি সুবিন্যস্ত, গ্রন্থিত কোরআনের কপি সংগ্রহ করা, যাতে প্রয়োজনের সময় এর দ্বারস্থ হওয়া যায় ।এটি ১৩ হিজরিতে শুরু হয়ে পূর্ণ এক বছর মতান্তরে প্রায় দুই বছরে সমাপ্ত হয় । (তারিখুল কোরআনিল কারিম, তাহের আল কুরদি; খ. ১, পৃ. ২৮)

হজরত আবু বকর (রা.) সংকলিত কোরআনটি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিল ।এরপর উমর (রা.)-এর কাছে।তাঁর শাহাদাতের পর নিজ অসিয়ত মোতাবেক রাসুল (সা.)-এর স্ত্রী, নিজ কন্যা হাফসা (রা.)-এর কাছে বিদ্যমান ছিল।অতঃপর মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর রাজত্বকালে এ কপিটি চাইলে তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান ।হাফসা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর মারওয়ান এ কপি হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর কাছ থেকে নিয়ে যান।অতঃপর তিনি এ চিন্তা করে সেটি জ্বালিয়ে দিয়েছেন যে উসমান (রা.)-এর খেলাফত আমলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তুতকৃত কপির সঙ্গে এর কেরাতের পার্থক্যের কারণে অদূর ভবিষ্যতে ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে ।কেননা উসমান (রা.) সাত কেরাতের পরিবর্তে এক কেরাত , আঞ্চলিক একাধিক ভাষার পরিবর্তে প্রমিত এক ভাষায় সে কোরআনটি সংকলন করেছেন। (উলুমুল কোরআন, তক্বি উসমানি, পৃ. ১৮৬-১৮৭) (চলবে)

চিঠি বনাম মোবাইল

রমজান আলি পিয়াদা (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)

চিঠি লেখা হয় না অনেক দিন ।বলা যায় কারো কাছেই লেখা হয় না ।কেন জানি প্রয়োজনও মনে করি না কিম্বা উপলব্ধিও করি না ।বিপরীতে আমার কাছেও তেমন একটা চিঠি আসে না আগের মতো ।মাঝে মাঝে কয়েকটা আসে তাও হাতেগোনা।তবে চিঠি পড়ার মজাই আলাদা।অন্যরকম আনন্দ, উপলব্ধি, অনুভূতি চিঠি লেখা ও পড়াতে রয়েছে তা এখনো ভুলে যাইনি।যখন চিঠি লিখতে বসতাম তখন কতই না ভালো লাগতো।নিজের মনের কথাগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখতাম কালো কালি দিয়ে কাগজে ।পাঠিয়ে দিতাম প্রিয়জনের কাছে।কিন্তু এখন আর চিঠি লেখা হয় না ।যান্ত্রিকতা আমাদের অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে ।আমরা এখন বড়ই ব্যস্ত ।ব্যস্ততা আমাদের ঘিরে রেখেছে।আমাদের এখন আর সময় হয় না চিঠি লেখার ।চিঠি লেখাটাকে অপচয় বলেও মনে হয় অনেকের কাছে।কিন্তু এটা যে বাঙালির অন্যতম সংস্কৃতি এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই ।কি জানি, হয়তো একদিন এ-বিষয়টি রূপকথার গল্পের মতো মনে হবে।

বর্তমান যুগটাকে মোবাইলের যুগ বললে ভুল হবে না ।আর এই মোবাইলের কারণেই চিঠি লেখা হয়ে ওঠে না।প্রিয়জনের কাছে মোবাইলে এক মিনিটে সরাসরি দু 'টি কথা বললেই যথেষ্ট ।সেইসঙ্গে এটাও এখন আর অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে , চিঠি লেখার আনন্দটা এখন আর কারো মনে দাগ কাটে না ।আমার মতো হয়তো অনেকেই একথা স্বীকার করবেন ।আগের মতো এখন পোস্ট অফিসগুলোতে ভিড় লক্ষ্য করা যায় না।চিঠিপত্রও তেমন একটা বিলি হয় না।শুধুমাত্র অফিসিয়াল কিছু চিঠি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।সরকারের আয়ও এদিক দিয়ে কমে গেছে।অর্ধেকেরও কম চিঠি বিলি হয়।এমন একদিন আসবে যখন আদৌ তা বিলি হবে না ।এই সেদিনও মানুষ আপনজনের খবর নিতে চিঠি লিখতে বসতো।কোনো প্রিয়জনের কাছে চিঠি লিখতো সুন্দর কাগজে সুন্দর কলমের ছোঁয়ায়।অনেক ভেবে ভেবে প্রতিটি লাইনে সাজিয়ে রাখতো নিজের কথাগুলো ।আবার মানুষও চিঠি পড়া দারুণ পছন্দ করতো ।প্রিয়জনের চিঠির জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতো ।ভাবতো ‘কেমন আছে, কি করছে, কি খাচ্ছে।আর সেই ভাবনা গুলো লিখতো চিঠিতে । কিন্তু মোবাইল আসার ফলে সেই চিঠি লেখার ঐতিয্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।মানুষ চিঠিতে যে ভাব ও আবেগ প্রকাশ করত মোবাইলে যেন সেই আবেগের মৃত্যু হয়েছে । একথা অনেকেই স্বীকার করবেন যে , সরাসরি কথা বলে তা প্রকাশ করা যায় না । চিঠির প্রতিটি লাইনে মিশে থাকে ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি, স্নেহ, প্রেম-প্রিয়জনের স্পর্শ।এই চিঠি একবার নয় বার বারও মানুষ পড়ে থাকে।যত্ন করে রেখে দেয় স্মৃতি হিসেবে ।প্রিয়জনের উপস্থিতি উপলব্ধি করে।জীবনের ভালমন্দ ডকুমেন্ট হিসেবে থেকে যায়।মন নেচে ওঠে কোনো প্রিয়জনের চিঠির প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে প্রতীক্ষার পালা শেষ হলে।যখন চলে আসে কাঙ্খিত চিঠিখানা ।কিন্তু বর্তমানে ভাইরাসের মতো মানুষকে আক্রমণ করেছে এই মোবাইল ।মোবাইল প্রয়োজনীয় বস্তু তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।কিন্তু কারো কাছে তা বিরক্তিকর , বা হাতিপোষা, কারো কাছে বাড়তি ঝামেলার মতো।সাংসারিক জীবনের ব্যয়ের সাথে অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত করেছে এই মোবাইল ।কারণ আগে মানুষ ২/৫ টাকায় অনেক কথা চিঠিতে লিখে জানাতে পারতো।কিন্তু এখন মোবাইলের মাধ্যম সরাসরি কথা বলছে।আর এই কথা বলতে গিয়ে খরচ হচ্ছে সাংসারিক জীবনের একটি বিরাট অঙ্কের টাকা ।এই যান্ত্রিক যুগ ও ব্যয়বহুল দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতির সময়েও মানুষ মোবাইল ছাড়া চলতে পারে না ।তবে একথা স্বীকার করতেই হবে , উৎসব-

পরবে শুভেচ্ছা জানাবার খরচ কার্ডের তুলনায় মোবাইলে অনেক কম ।এখন আর আগের মতো মানুষ আবেগ জড়ানো ভাষা ও ছন্দ দিয়ে চিঠি লেখতে তেমন একটা বসে না ।কারণ সবকিছুই সে নগদে সরাসরি পাচ্ছে।খুবই কমই চিঠি লেখা হয় কারো কারো।এমন অনেকে আছেন যারা হয়তো হঠাৎ করে একদিন বলবেন, "চিঠি লিখি না অনেকদিন হলো।কবে শেষ লিখেছি মনে নেই।অর্থাৎ চিঠি লেখাও অনেকে ভুলতে বসেছেন।যেমন সত্য, আমাদের জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু।আগে যেভাবে এই খেলা হতো এখন হয়ই না — অথচ এটা আমাদের জাতীয় খেলা ।কেউ আর এখন এই খেলাটি খেলে না।সঠিকভাবে এই খেলার নিয়মও কেউ জানি না।হয়তো চিঠির বিষয়টিও একদিন এমনটিই হবে।মানুষ এখন পাগল কোনো প্রিয়জনের কাছে সরাসরি কথা বলতে ।কিন্তু আমার কথা হলো , যখন মোবাইল প্রচলিত ছিলো না তখন কি দুনিয়া চলেনি ? তখন তো মানুষ যোগাযোগের সবকিছুই চিঠির মাধ্যমে করতো।দূরের ছাত্র যারা তারা অপেক্ষায় থাকতো কখন আসবে মায়ের চিঠি ।মায়ের চিঠি যে কত মধুর তা হয়তো বা এ প্রজন্ম কিংবা আগামী প্রজন্ম জানবে না।কারণ, তারা এখন মোবাইল যুগের ছেলেমেয়ে ।তারা জানে কিভাবে ম্যেসেজ লিখতে হয়।কলমের ভাষায় বাবার শাসন, বড় ভাইয়ের উপদেশ বারবার বিবেককে তাড়া দিতো । এখন মোবাইল যুগে'তা হয় না।বাবার চিঠি পড়ার পর ছেলে খারাপ বন্ধু -বান্ধবদের সাথে একটু হলেও কম ওঠা -বসা করতো।দুঃখ হলেও সত্য যে, মোবাইল যুগে যখন বাবার ফোন আসল তখন হয়তো আদরের সোনা ছেলে কোনো এক নেশার আস্তানায় অথবা বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মেতে উঠেছে ।বর্তমান যুগে তো বড়দের নমস্কার , প্রণাম জানানো একেবারে নেই বললেই চলে । সম্মানবোধ প্রায় হারাতে বসেছে।বাবার ফোন এলে হয়তো ছেলে রিসিভ করে বলে, 'হ্যালো বাবা, আমি এখন মহা ব্যস্ত ।পরে আমি তোমার কাছে কল ব্যাক করছি-এ কথা বলেই হয়তো লাইনটি কেটে দিল।বাবা এতক্ষণে' বুঝে ফেলেছেন তার ছেলে বিরাট ব্যস্ত ।মা যখন চিঠি লিখতো তখন সন্তানকে আশীর্বাদ করতো।স্নেহ আর ভালোবাসার কথা জানাতো ।উপদেশ দিতো প্রতিটি অক্ষরে ।সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজ সন্তানকে প্রার্থনায় উৎসর্গ করতো ।কিন্তু বর্তমানে চিঠির মাধ্যমে তা আর হয়ে উঠে না ।কেননা এখন মোবাইল যুগ।-

তখনকার দিনে প্রেমিক রুমালে নক্সা করে , কাঁথায়, গাছের পাতায় কিম্বা রঙিন কাগজে নিজ প্রিয়ার কাছে চিঠি লিখতো মনোযোগ দিয়ে আবেগ জড়ানো ভাষায় – গোপনে।কিন্তু এখন গোপনে নয় -সবটাই বা অনেকটা প্রকাশ্যেই । মোবাইলে বলে 'তুমি তাড়াতাড়ি এসো আমি অমুক জায়গায় ওয়েট করছি ।' কিম্বা রাত জেগে মোবাইলে চলে প্রেমালাপ।ঘন ঘন মোবাইলে মেসেজ পাঠায় 'আই লাভ ইউ'।এখন ডাক-পিয়নদেরও কম পরিশ্রম করতে হয় ।চিঠির বোঝা আগের মতো বেশি হয়না ।বেশি বেশি ঘুরে বেড়াতে হয় না গ্রাহকের কাছে ।আগের মতো আর সময়ে অসময়ে পিয়ন নাম ধরে ডাক দেয় না—'চিঠি এসেছে বলে।চিঠি সাহিত্যেরও একটি অংশবিশেষ।অন্তত বাংলা সাহিত্যে।চিঠিতে যেভাবে যতখানি মনের ভাব প্রকাশ করা যায় মোবাইলে ততটা কল্পনাও করা যায় না ।তাছাড়া চিঠির চেয়ে মোবাইল অনেকটা আর্থিক অপচয় ঘটায়।তাই আসুন, আমরা আবার চিঠিপত্র লিখতে শুরু করি ।তাতে আমাদের বাংলা সাহিত্য বাঁচবে।হাতের লেখাও সুন্দর হবে।ফিরে পাবো অতীত ঐতিহ্য।

কোনটা বেশি শক্তিশালী সমালোচনা করা নাকি সমালোচিত হওয়াঃ একটি নিবন্ধ

মাইমুনা তাহেরা(বাংলা)

পেছনে ও সামনে প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ-ধ্বংস। (সূরা হুমাযাহ, আয়াত : ০১)

কেউ যখন তার স্রষ্টা প্রদত্ত দক্ষতা , যোগ্যতা এবং উদ্ভাবনী মন ও মনন নিয়ে নতুন কিছু করতে চায় , তখনই সুবিধাভোগী ও সুযোগসন্ধানী একদল লোকের আঁতে ঘালাগে ; ফলে তারা অযৌক্তিকভাবে সমালোচনার বাজার জমিয়ে তুলতে থাকে। ভুল না দেখিয়ে ভুলের অপেক্ষায় তারা বসে থাকে । অনিচ্ছাকৃত কোনও ভুল হয়ে গেলেই নির্বিচারে তা নিয়ে সমালোচনায় লিপ্ত হয় ।এরা আসলে নিন্দুক, হিংসুক এবং কুৎসারটনাকারী।এদের সমালোচনায় থাকে স্বার্থ , হিংসা , ঘৃণা এবং যুক্তিহীন ক্ষোভ।এধরণের নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা দ্বারা পুষ্ট মানুষেরা অগঠনমূলক সমালোচনাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র বলে মনে করে ।যুক্তি, দর্শন কোনও কিছুকেই এরা তোয়াক্কা করে না । বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ এদেরকে অমানুষে পরিণত করে।সেহেতু সমালোচনার মাধ্যমে অন্যের ক্ষতি করছে ভেবে বোঝার মতো মাথায় যে ঘি টুকু থাকা দরকার । সেটুকু হয়তো তাদের নেই ।কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত চমৎকার বলেছেন-

"নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভাল
যুগ জনমের বন্ধু আমার আঁধার ঘরের আঁলো।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে, বন্ধু যারা আছে,
নিন্দুক সে ছায়ার মত থাকবে পাছে পাছে।
বিশ্বজনে নিঃস্ব করে পবিত্রতা আনে,
সাধক জনে নিস্তারিতে তার মত কে জানে?
বিনামূল্যে ময়লা ধুয়ে করে পরিষ্কার,
বিশ্বমাঝে এমন দয়াল মিলবে কোথা আর?
নিন্দুকে সে বেঁচে থাকুক বিশ্ব হিতের তরে;
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে।"

সমালোচনার দুষ্টচক্রে নিষ্পেষিত সচেতন ব্যক্তিরা আলোচিত হতে হতে একসময় আলোকিত হয়ে ওঠেন ।কারণ, সমালোচনার কারণে তারা তাদের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হন এবং সেগুলি সংশোধন করতে করতে এক সময় তারা সমৃদ্ধ হন ।এই বাস্তবতা উপলব্ধি করার মতো বোধশক্তি টুকুও যাদের নেই , কেবল তারাই দীপ্যমান সূর্যের অপ্রতিরোধ্য আলোক রশ্মিকে প্রতিরোধ করার পাগলামিতে লিপ্ত হয়ে জীবনের মহামূল্যবান সময়গুলোকে নষ্ট করে।অথচ সূর্যকে থামিয়ে দিয়ে তার গতি রোধ করা যায় না ।সূর্য মানে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমালোচিত মানুষ।যেপ্রতিদিন সমালোচকদের অর্থহীন কথা এবং যুক্তিহীন ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে ও পুড়ছে ।এমন করে জ্বলতে জ্বলতে কোনও একটা সময়ে সহনশীলতার আবরণ ভেদ করে তার দগ্ধ হৃদয় হিংসুক সমালোচকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে ওঠে—"তোমাদের ঘৃণা করতেও আমার ঘৃণা হয়" ।

এখান থেকেই শুরু হয়মুক্ত মন নিয়ে দুর্বার গতিতে সমালোচিতদের পথ চলা ।তারা আর থেমে থাকে না ।থমকে দাঁড়ায় না।কারও প্রশংসায় ফুলে ওঠে না আর কারও নিন্দায় মনোবল হারায় না।সম্ভাবনার এক একটাবদ্ধ দুয়ারকে

ভেঙে তারা এগিয়ে যায় তাদের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে ।আর সমালোচনাকারীরা আটকে যায় নিজেদের বানানো অবরুদ্ধ নগরে।গঠনমূলক সমালোচনার পরিবর্তে অগঠনমূলক নেতিবাচক শক্তিতে ভর করা বিবেকহীন সমালোচকদের বাড় যত বাড়তে থাকে , বুদ্ধিমান সমালোচিত মানুষদের ইতিবাচক জেদটাও তত বাড়তে থাকে ।ফলে অযৌক্তিক সমালোচনাকারীরা দিন দিন পিছিয়ে পড়ে আরশুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমালোচিতদের অগ্রযাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নিজে না পারার অক্ষমতা থেকে সমালোচকদের ভগ্ন হৃদয়ে যে হতাশা জন্ম নেয়, তা দূর করার জন্য সঠিক পথ ও পন্থা অবলম্বন না করে , যারা পারছে তাদেরকে হতাশার সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে এরা সমালোচনাকেই বেছে নেয় ।নিন্দুক সমালোচকেরা দুর্বল এই হাতিয়ারের মাধ্যমে ক্ষেত্রবিশেষে সাময়িক সুবিধা হয়তো পেতে পারে , তবে পরিণামে এই দুশ্চরিত্র তাদের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে দেয়।শক্ত মেরুদণ্ডে পচন ধরায় ।পৃথিবী এদেরকে কখনও মনে রাখে না।পক্ষান্তরে ব্যক্তিত্ব এবং আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন সমালোচিতরা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাস হয়ে থাকে।

নিজস্বকথন

সুমাইয়া খাতুন (বাংলা)

উফ্, দিদি যে কোথায় গেলো ।ইষার চোখের বিরক্তি ক্রমেডায়েরি -র দিকেঅগ্রসর হয় ।সেদিকেই তাকিয়ে আছে এখননো।প্রায় তিরিশ সেকেন্ড অতিক্রান্ত।আসলে সেতো এতক্ষণ খুব মনোযোগের সহিত নিজের প্রজেক্ট এর কাজে ব্যস্ত ছিল ।এরই মাঝে পৃষ্ঠার এলোমেলো উড়ে যাওয়ার শব্দে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই রঙিন ডায়েরি ।ইষার একনিষ্ঠতায় ব্যাঘাত ঘটে।একটানা কাজের মাঝে বিচ্ছেদ এসে উপস্থিত হয়।

ওদিকে এখনো নীলচে রঙা ডায়েরি খানা তার পাখা ঝাপটাচ্ছে।কলম খসে পড়েছে তার ডানা থেকে।এতক্ষণে পৃষ্ঠা আর কলমের বাগবিতন্ডা শেষ হল বুঝি।

ইষা সেদিকে এগিয়ে গিয়েও কি মনে করে আবার ফিরে এলো স্বস্থানে ।পৃষ্ঠা উল্টে দেখার আগে তার মনে পড়ে গেলো তাকে বলা দিদির সেই নীতি বাক্য।যা সে কিছুদিন আগে তার দিদির কাছেই শুনেছে, শিখেছে - '' ডায়েরির প্রতিটি পাতা এমনকি প্রতি শব্দ -বর্ণ-বাক্য প্রত্যেকের কাছেই খুউউউব স্পেশাল , খুবই ব্যাক্তিগত।কারোর বিনা অনুমতিতে তা স্পর্শ করাও গুরুতর অপরাধ।

শুদ্ধ সমাজ গঠনে ইসলামের ভূমিকা

ফতেমা খাতুন(বাংলা অনার্স)

একথা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে বর্তমান যুগ বড়ই উন্নতির যুগ । প্রতিটি মানুষ উন্নতির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানও উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে, কিন্তু বিজ্ঞান দিনের পর দিন দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।আর বর্তমান সমাজ যতো অবনতি র দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজে কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ছে ,পরিবেশ দূষণ হচ্ছে ,মানুষ মনুষত্ব হারাচ্ছে। একে অপরকে সম্মান দেয় না। হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা ও বড়রা ছোটদেরকে স্নেহ করতে চায় না।পিতা মাতা পায়না নিজেদের প্রাপ্য। মানুষ নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। প্রতিবেশী ও দরিদ্ররা বঞ্চিত হচ্ছে নিজেদের প্রাপ্য হতে। ফলে সমাজ পরিণত হচ্ছে স্নেহ ভালোবাসা সহানুভূতি হীন একটি পশু সমাজে । কিন্তু ইসলাম ধর্মে এদিক দিয়ে পূর্ণ সচেতন নির্দেশ আছে। সমাজ থেকে কুসংস্কার, হিংসা -বিদ্বেষ ইত্যাদিকে দূর করে একটি শান্তিপূর্ণ সুসমাজ গঠন করা কথা বলা আছে। এখানে কিছু উল্লেখ করা যায়-

স্বামী স্ত্রীর হক তথা অধিকার বা কর্তব্য :

স্বামী স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্ক থাকে । আর এটা থাকা দরকার নতুবা সংসারে অশান্তি হতে পারে। এইজন্য ইসলাম এই সম্পর্ককে বজায় রাখার জন্য সুস্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। স্বামী- স্ত্রীর ইভয়ের উচিত একে অপরের সম্মান করা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা 'আলা বলেন 'সৎ চরিত্রবান মহিলা যারা আল্লাহর উপাসনা আরাধনা করে ও স্বামীর অনুপস্থিতে তার সমস্ত জিনিসের হেফাজত করে ।সুতরাং সৎ মহিলারা অনুগত হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতে তার আমানতকে সংরক্ষণ করে ।

ইসলাম স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে ,স্বামী স্ত্রীকে পরিপূর্ণ ভালবাসবে এবং নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী ভাল খাওয়া ও ভাল পরিধান করাবে। স্ত্রীর মন তুষ্ট রাখা যেমন অনেক সওয়বেরকাজ , তেমনি স্ত্রীদেরও স্বামীর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই , নিজ লোকমা বানিয়ে স্বামীর মুখে তুলে দিলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ গৃহে স্ত্রী গণের কাছে যেতেন তখন তাদের সাথে অতি নম্র ভদ্র ব্যবহার করতেন । (নাসায়ী শরীফ)

নবী সল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে অনেক কাজ সম্পাদন করতেন , যেমন আটা ভাঙ্গানো ,পানি যোগাড় করা ইত্যাদি। নবী সল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম দুজাহানের সরদার হয়েও নিজ হাতে স্ত্রীদের সাথে মিলে মিশে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করতেন। আমরা তারই উম্মত সুতরাং তার সুন্নতে অনুসারী হওয়াই আমাদের উচিত ।নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যার চরিত্র সর্বাপেক্ষা ভাল সেই সর্বাপেক্ষা ঈমানদার ,আর তোমাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তুমি যখন খাবে তখন তাকে খাওয়াবে। তুমি যখন পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে। স্ত্রীরকে আঘাত করবে না, গালি দেবে না। স্ত্রীকে রেখে কোথাও যাবে না । তবে যদি প্রয়োজন মনে করো ,তবে শাসনের জন্য ঘরের মধ্যে বিছানা পৃথক করে দিতে পারো ।

প্রতিবেশীর হক তথা অধিকারঃ

ইসলাম যে রূপে পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে বলেছে তেমনি প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে । পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক একটি আয়াতে তিন প্রকার প্রতিবেশীর

উল্লেখ করেছেন এবং সমস্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে বলেছেন ।প্রথম ওই প্রতিবেশী যে প্রতিবেশী হওয়ার সাথে সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখে এবং দ্বিতীয় কেবল ঐ প্রতিবেশী যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না । এরমধ্যে অমুসলিমও থাকতে পারে । তৃতীয় ঐ সমস্ত লোক যাদের সঙ্গে হঠাৎ সম্পর্ক হয়ে গেছে। যেমন ভ্রমণের সঙ্গী ক্লাসের সঙ্গী ইত্যাদি । এর মধ্যে মুসলিম অমুসলিম থাকতে পারে ।ইসলাম উক্ত তিন প্রকার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা নির্দেশ দিয়েছে।

বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট ও কঠোরভাবে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর এবং কেয়ামতের উপর ঈমান রাখতে চায় সে যেন নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না । অন্য একটি হাদিসে বলেন :ওই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান নয় যে নিজে পেট ভরে খায় এবং তার প্রতিবেশী ক্ষুধা থাকে । নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম বলেন ওই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয় যার অত্যাচারে তার প্রতিবেশী শান্তিতে থাকতে পারেনা ।

দুর্বল অসহায় ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করা :

নবী সল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম দাতাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ফজিলত বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে কিছুটা উল্লেখ করা হলো - বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু সাল্লাম নিজের আঙ্গুল কে মিলিয়ে এবং উভয়ের মাঝে সামান্য ফাঁকা রেখে বলেন যদি কেউ কোনো এতিম বাচ্চার খাওয়া -দাওয়া পোশাক পরিধান ইত্যাদি দায়িত্ব নেয় তাহলে জান্নাতে সে আর আমি এত নিকট হব যতটা এই দুটো আঙ্গুল একে অপরের নিকটে

ওপর একটি হাদিসে আছে।

বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি বিধবা গরিব এবং অভাবগ্রস্তদেরকে খোঁজ -খবর নেয় এবং সাহায্য করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে সে ব্যক্তি মুজাহিদের সমতুল্য এবং সওয়বে দিকদিয়ে ওই ব্যক্তির সমতুল্য যে সর্বসময় দিনেতে রোজা রাখে আর রাত্রে নফলনামাজ পড়ে

বড়দের প্রতি ছোটদের এবং ছোটদের প্রতি বড়দের কর্তব্য।

ইসলাম এটাও শিক্ষা দিয়েছে যে ছোটরা বড়দেরকে সম্মান করবে এবং তাদের সামনে আদবের সাথে থাকবে এবং বড়দের কর্তব্য যে তারা যেন ছোটদেরকেস্নেহে মায়া মমতা দিয়ে ভালবাসেযদিও তার আত্মীয় নাইবা হোক সুতরাং নবী সাঃ বলেন যে বড় ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং ছোট বড়দের কে সম্মান করে না সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয় ।

মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার:

হক কর্তব্য নির্দিষ্ট করে রেখেছে ঠিক তদ্রূপ পিতা মাতার উপর সন্তানদের কিছু কর্তব্য রেখেছে যেমন ইসলামী শিক্ষা দেওয়া ও সুন্দর চরিত্র গঠন করানো , আল্লাহ তাআলা পিতা মাতার উপরে ফরজ করেছে যে নিজের সন্তানদের ও পরিবারকে এমন লালন পালন করবে যে মৃত্যুর পরও জাহান্নামে না যায়।

মহান স্রষ্টাআল্লাহ পাক বলেন হে ঈমানদারগণ নিজে ও নিজের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের পূর্ণতার জন্য চরিত্র গঠন করতে বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে সম্বোধন করে বলেন

হে আবু হুরায়রা তুমি তোমার চরিত্র সুন্দর কর।